উপন্যাস

বৃক্ষ অনুবাদক

শ্রীজাত

boierhut.com/fb

বৃক্ষ অনুবাদক

শ্রীজাত

It is impossible to translate poetry. Can you translate music?

—Voltaire

—আজ কেমন আছেন?

—আগের দিনের মতোই। জিজ্ঞেস করার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর।

—খোঁজ রাখাটাই তো আমার কাজ, তাই না কি?

—তা একরকম বলতে পারেন।

—আপনি হয়তো ভাবছেন সন্ধের মুখে এসে বিরক্ত না করলেই পারত। একটু হাঁটতে বেরোতেন কি?

—না না, তা কেন। এ তো আপনার কাজ। কাজ তো করতেই হবে। বসুন। গুছিয়ে বসুন।

—ধন্যবাদ। কী পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখেন ঘরখানা, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

—ওই আর কী। এখন ঘর গুছিয়ে রাখা ছাড়া কাজ তো নেই বিশেষ।

—আর? আপনার চিঠিপত্র লেখা? চলছে কেমন?

—লিখিনি এই ক'দিনে। লেখবার কথা ভেবেছি, কিন্তু লিখে ওঠা হয়নি।

—ক্লান্ত বোধ করছেন কি?

—নাহ্ তো।

—খিদে ঘুম হচ্ছে ঠিকমতো?

—তাই তো মনে হয়, হচ্ছে।

—মিসেস মার্থার ঘরে ভিজ়িটে গিয়েছিলাম একটু আগে। অভিযোগ করলেন আপনার নামে। আপনি নাকি ডিনার করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

—মার্থা এমনটা বলল বুঝি? ওর কথা কানে তুলবেন না ডক্টর। ও নিজের অপরাধ লুকনোর জন্য প্রতিবেশীর নামে এইসব বলছে।

—উনি কিন্তু আপনার জন্য ভারী চিন্তিত। ওঁর স্বাস্থ্য অবশ্য ভালই দেখলাম। মনে-টনে রাখতে পারছেন কথা-টথা। ভাল ব্যাপার।

—বাহ্, শুনে খুশি হলাম। মার্থা সত্যিই একজন গুণী মহিলা।

—তা ঠিক, তা ঠিক। আচ্ছা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমরা সেই আগের দিনের মতোই আর কী, সেই বিশেষ খেলাটা একটু খেলব।

—কোন খেলা?

—সে কী! মনে নেই আপনার? এই যে ক'দিন আগে ভিজ়িটে এলাম, তখনই তো... একেবারেই মনে রাখতে পারছেন না, না?

—মনে থাকছে তো। স্পষ্ট মনে থাকছে। অনেক দিন আগেকার সব কথাবার্তা, তাজা হয়ে আছে স্মৃতিতে। যদি বলেন গত কয়েক বছরের কথা, তা হলে বলব ঝাপসা লাগে এখন। অবশ্য, গত কয়েক বছরে মনে রাখার মতো কী-ই বা ঘটেছে!

—তা বেশ বেশ। কিন্তু ইদানীংকার কথা ভুলে গেলেও তো চলবে না। ওষুধপত্তর সব নিচ্ছেন তো ঠিকঠাক?

—তা নিচ্ছি।

—আচ্ছা বেশ। শুরু করা যাক তা হলে?

—কী?

—ওই যে, সেই খেলাটা। আমি একটা শব্দ বলব, আপনি তার প্রতিশব্দ বলবেন? সব মিলিয়ে গোটা কুড়ি আর কী। সময় নিলে চলবে না কিন্তু। ঝটপট উত্তর দিতে হবে, কেমন?

—ওহ্।

—আহা, আপনি আবার এটাকে পরীক্ষা বলে ভেবে বসবেন না যেন। এ একটা রুটিন খেলা আর কী। তার বেশি কিছুই নয়। বুঝলেন না?

—এমনিতেও ও দুটোয় বিশেষ ফারাক আমি দেখি না।

—ইয়ে, মানে, কোন দুটোয়?

—খেলা আর পরীক্ষা।

—আপনার মজা করার স্বভাবটা কিন্তু গেল না। ভাল, তা ভাল। এসব শুকনো হাওয়ার মরসুমে নিজেকে একটু মজায় রাখতে হয় বইকি। তা হলে, শুরু করি?

—করুন।

—ঠিক আছে। আমি একটা করে শব্দ, আর আপনি তার...

—প্রতিশব্দ।

—একেবারে ঠিক।

—জানি। শুরু করুন।

—বিস্মৃতি?

—চাবি।

—তিক্ততা?

—রোদ্দুর।

—লাল?

—ভণিতা।

—বিপ্লব?

—শব্দ।

—ঝুড়ি?

—মহাকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অরণ্য?

—অপেক্ষা।

—সংগীত?

—পথ।

—স্কার্ট?

—ঈর্ষা।

—মাংস?

—বন্ধু।

—কুকুর?

—মনঃসংযোগ।

—সব্‌জি?

—হত্যা।

—দোকান?

—ছদ্মবেশ।

—নাবালক?

—ভিড়।

—উড়োজাহাজ?

—সংক্রমণ।

—আবিষ্কার?

—ভ্রম।

—শস্য?

—দৃষ্টি।

—অস্ত্র?

—ইতিহাস।

—চিরকুট?

—অতীত।

—কক্ষপথ?

—ঘুম।

—সমুদ্র?

—... ... ...

—সমুদ্র?

—... ... ...

—আপনি শুনতে পাচ্ছেন প্রফেসর ব্রাইট?

—হ্যাঁ? হ্যাঁ, এই তো পাচ্ছি।

—শেষ শব্দের জবাবটা দিলেন না যে?

—দিলাম না, না? কী ছিল যেন?

—সহজ শব্দ। সমুদ্র।

—সমুদ্র... সমুদ্র... আচ্ছা ডক্টর, সমুদ্র বলতে মনে পড়ল, বেশ কিছুদিন ধরেই আমি অনুরোধ জানিয়ে আসছি আপনাদের, একবার সমুদ্রের ধারটা ঘুরিয়ে আনার জন্য। সেদিকে আপনারা একেবারেই কি কান দিচ্ছেন না?

—ওহো, এখন আবার এসব কথা কেন বলুন দেখি... বেশ তো আমরা...

—মার্জনা করবেন আমাকে, এখন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্য, কিন্তু কাকেই-বা আমি বলব বলুন? অফিসার সাহেব আসেন হয়তো মাসে এক কি দু'বার। ওঁর ওই গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করে দিতে ইচ্ছে হয় না আমার। আপনি হপ্তায় একবার আসেন, খোঁজখবর নেন, বন্ধুর মতো মেশেন, সত্যি বলতে কী, এখানে প্রতিটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে আপনি এত জনপ্রিয় যে...

—হেঁ হেঁ... মানে... কী যে বলেন...

—সেই কারণেই আমি আপনাকে বলে ফেলি এসব কথা। এখান থেকে দূর তো নয় বেশি, মাইল দুয়েক হবে? নাকি?

—তার কিছু বেশিই হবে হয়তো। আপনার এই আর্জির কথা আমি বড় সাহেবের, মানে অফিসার মশায়ের কানে তুলেছি। একটা লিখিত দিতেন যদি...

—সমুদ্র দেখবার লিখিত আবেদন? বলছেন?

—মানে... সে থাক গে। ও নিয়ে পরে কথা হবে। কিন্তু আমি যেটা দেখলাম, আপনি কেমন একটা খেলছেন ব্যাপারটা নিয়ে। আগের দিনও লক্ষ করেছি, ঠিক গম্ভীরভাবে ব্যাপারটাকে নিচ্ছেন না। মানে, আপনার মতো একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি এই সামান্য ক'টা শব্দের ঠিকঠাক প্রতিশব্দ নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। বা, ভুলে গেলে, মানে সেইটাই তো আপনার অসুখ, যাকে বলে, বুঝতে হবে। কিন্তু ঠিক কেমন ভাবে যেন আপনি উত্তরগুলো দেন, আমি খেয়াল করেছি... এরকম করলে আমিই বা...

—কিন্তু গোড়াতে আপনিই তো বললেন, এটা এক ধরনের খেলা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বললাম ঠিকই, সে আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খেলাতেও আপনি এর চেয়ে অনেক নিখুঁত ভাবে স্কোর করতে পারবেন। আসলে কী জানেন তো, অ্যালঝাইমার্স পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই স্কোরগুলো মান্য বলেই ধরা হয় কি না... তাই বলছিলাম আর কী... আপনাকে আর কী-ই বা বোঝাব। এত নামকরা মানুষ আপনি, এত কাজ করেছেন সারা জীবনে, মানে লেখালিখির ব্যাপারে...

—ওসব এখন থাক ডক্টর। আপনি একটু চা নেবেন কি? অথবা ওয়াইন? ভাল অস্ট্রেলিয়ান ওয়াইন এসেছে একখানা, গত হপ্তায়। খুলিনি এখনও।

—না না, ধন্যবাদ প্রফেসর ব্রাইট। এখনও আমাকে চারজন পেশেন্ট ভিজিট করতে হবে। সে একদিন পরে আড্ডা দেওয়া যাবে 'খন।

—বেশ, যেমন আপনার মর্জি।

—আজ, উঠি তা হলে?

—আসুন।

—ভাল থাকবেন।

—আপনিও।

—দরজাটা, খোলাই থাকল তাহলে?

—ওহ, এক মিনিট, এক মিনিট!

—কী ব্যাপার? কিছু বলবেন?

—মনে পড়েছে।

—কী?

—ওই যে, আপনি সমুদ্রের প্রতিশব্দ জিজ্ঞেস করলেন, তখন উত্তর দিতে পারিনি।

—বেশ তো, বলুন না এখন। আমি না-হয় যোগ করে নেব খাতায়।

—অভিধান।

—সমুদ্রের প্রতিশব্দ?

—সমুদ্রের। প্রতিশব্দ।

—শুভরাত্রি প্রফেসর ব্রাইট।

—শুভরাত্রি ডক্টর বয়েল।

দুই

বুকের দিকে সোজাসুজি ওইভাবে তাকানো যায় নাকি কখনও, যখন বুক মানে মেয়েদের বুকের কথা বলা হচ্ছে? যখন বুক মানে বোঝানো হচ্ছে বর্ণনার অতীত অথচ গোপন সমস্ত প্রেইরি তৃণভূমির কথা, যাদের ঢালের ওপর ভর দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ফলিয়ে গিয়েছে শস্যের অলস দুলুনি এবং পুরুষদের শান্ত বাড়ি ফেরা, তখন চোখ বন্ধ করে ওইরকম ভাবতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু চারপাশে ব্যস্ততার টানে ভেসে বেড়ানো মেয়েদের, মহিলাদের বুকের দিকে সাহস করে কি তাকিয়ে ফেলা যায় তাই বলে? অন্তত সম্যকের সেই সাহস হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যে এই তেরছা-মিঠে রোদ-এসে-পড়া গালিচা-পাতা চওড়া-চৌকো চত্বরটায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের ভাসমান বুকেদের দিকে চোরাগোপ্তা চাউনি দিচ্ছে না, তাও অবশ্য নয়।

সম্যক, বছর সাতাশের লম্বাটে, ছিপছিপে, এলোমেলো শার্ট আর জিনস পরা, অল্প ঝাঁকড়া চুল আর পরিষ্কার গালওলা, চোখে পুরাতনী ফ্রেমের রিমলেশ চশমা আঁটা, তীক্ষ্ণ মুখ আর চোখের অধিকারী—সম্যক এখন দাঁড়িয়ে আছে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় সাহিত্য উৎসব চত্বরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে, হে ফেস্টিভালের (Hay Festival) ঠিক মাঝখানে, যার কেতাবি নাম এই মুহূর্তে অথর্স লাউঞ্জ। সোজা কথায়, আমন্ত্রিত লেখকদের আয়েশ করে চা-কফি পান ও আড্ডাস্থল, যেখানে সারাক্ষণই লেখকদের হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে ও ছোটার ফাঁকে খানিক খোশগল্প করে জিরিয়ে নিতে দেখা যায় এবং খেয়াল করলেই বোঝা যায়, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনেকের জামায় চলকে পড়বে কফি বা চা, যদি-না তাঁরা গল্পের খেয়াল ভেদ করে ঠিক সময়ে কাপটিকে সোজা করে ধরে নেন আবারও।

প্রবল ছোটাছুটির এই শামিয়ানা তৈরি করা আছে উৎসবের ঠিক মাঝখানটায়। তাকে ঘিরে দশদিকে চলে গিয়েছে কাঠের পাটাতনের টানা সব রাস্তা, যারা শেষ হচ্ছে কোনও না-কোনও বাক্সমার্কা হলঘরে, যেখানে দিনের সবটুকু সময় ধরে সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান হয়েই চলেছে একের পর এক। কাঠের পাটাতনের এইসব রাস্তার শরীর যেমন সবুজ কার্পেটে মোড়া, তেমনই মাথার উপর তৈরি করা আছে ধবধবে সাদা ছাউনি। আর এই সমস্ত রাস্তার ধারে ধারেই তাঁবু সেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বইয়ের দোকান, খাবার আর পানীয়ের দেদার সব রেস্তরাঁ, পাঠক আর শ্রোতাদের জন্য আড্ডাঘর, এমনকী ছোটদের মনোমতো খেলাধুলোর জায়গাও। কিছু কিছু তাঁবুর ছাদ তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ প্লাস্টিক টাঙিয়ে, যাতে যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত মেঘছেঁড়া মিঠে রোদ্দুর মেঝেতে পড়ে থাকতে পারে অলসমতি সারমেয়র মতোই। যেমন লেখকদের চত্বরের একটা অংশ ঢাকা হয়েছে স্বচ্ছ আচ্ছাদন দিয়ে, আর তারই তলায়, একটু পরোক্ষ উষ্ণতা পোহাতে জড়ো হচ্ছেন নানা দেশ থেকে উড়ে আসা লেখকরা, মাঝেমধ্যেই।

এই গোটা আয়োজন থেকে দৃষ্টি গোটাতে গোটাতে সরতে থাকলে দেখা যাবে বিস্তীর্ণ এক মাঠে রাজকীয় কোনও সার্কাস দলের মতোই পাতা হয়েছে একের পর এক ঝলমলে সাদা তাঁবু আর শামিয়ানা, যাদের এ মাথা থেকে ও মাথা জোড়া আছে নানা রঙের কাগুজে ঝালর দিয়ে, আর মাঠের গোটাটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে সাদা কাপড়ের চওড়া সব ফিতে দিয়ে, সব মিলিয়ে ঝলমল করতে থাকা, এমনকী এই মনমরা বর্ষার রোদ্দুরেও ঝলসে ওঠা মিহি সাদা তাঁবু আর শামিয়ানার শান্ত ঝাঁক দেখলে বোঝাই যাবে, কার্নিভাল হচ্ছে। তারও থেকে সরে এলে, দূরে এলে, একটু উঠে এলে আমরা দেখতে পাব বিস্তীর্ণ সেই মাঠের একপাশে বয়ে চলা প্রাচীন এই শহর, যার নাম হে অন ওয়াই (Hay on Wye) আর অন্যপাশে, শামিয়ানার মাঠের অনেক বেশি শেষ পেরিয়ে জেগে ওঠা সবুজ-বাদামি বয়স্ক আর গম্ভীর পর্বতরাজি, যাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে ছায়ার পর ছায়া ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাজসিক সব মেঘের দল।

সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া অবশ্য এই লেখক চত্বরও। চতুর্দিকে যার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাতা হয়েছে নরম ও আরামদায়ক বাদামি সোফা, আছে ছোট ছোট চেয়ার আর টেবিল, একপাশে কফি, চা আর কেক-প্যাটির ছোট্ট কাউন্টার। সম্যক কলকাতায় বেশ কিছু সাহিত্যসভায় গিয়েছে ঠিকই এবং তুমুল ভিড়ের সুখ্যাতিসম্পন্ন বইমেলাতেও প্রতি বছর একের বেশি দিনই সে ঢুঁ মারে বটে, কিন্তু হালকা শিরশিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠান্ডা বিদেশি বাতাস দিয়ে ঘিরে রাখা এই উষ্ণ অথচ আর্দ্র রোদ্দুরের আয়োজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতেই সে বুঝতে পারছে, মানুষজনের একে অপরের ধাক্কা বাঁচাতে বাঁচাতে এদিক-ওদিক ছুটে চলা আর তারই মাঝে মাঝে জটলা বেঁধে হইহই গল্পগাছা জুড়ে দিতে থাকা কত-না দেশের মানুষজন— এমন মৃদু ব্যস্ততা, এমন মিশুকে ভিড় সে দেখেইনি কখনও।

কিন্তু ভাল হত, যদি-না এই চমৎকার বৃষ্টিহীন বর্ষাকালের সকালে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে ক্রমাগত চোখ রাখতে হত, বা বলা ভাল, আলগোছে চাউনি পাততে হত, চারপাশে হেঁটে, ছুটে এবং দৌড়ে বেড়ানো মেয়েদের বুকের দিকে। কারণ, প্রত্যেকের বুকেই ঝোলানো আছে নাম এবং দেশ লেখা আইডেন্টিটি কার্ড, যা পড়ে তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব। সম্যক খুঁজছে ক্যারোলকে। এখানে আসার আগে, দেশ থেকে তার সঙ্গে সম্যকের ই-মেল চালাচালি হয়েছে বটে, যেখানে নিজেদের কাজকর্ম আর ভাবনাপত্তরের কথা হালকা বিনিময় হয়েছে, কেননা, হে ফেস্টিভালে সম্যক আর ক্যারোলকে মিলিয়েই একটা সেশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা কথা বলবে দুই দেশের, দুই ভাষার, দুই কবির জীবন নিয়ে আর পড়ে শোনাবে যার যার অনুবাদ, তাই আসার আগে তাদের মধ্যে বাক্যবিনিময় হয়েছে বটে, কিন্তু সম্যক, হয়তো খানিকটা বোকার মতোই বা নেহাতই লজ্জায়, একটা ছবি চাইতে পারেনি ক্যারোলের কাছে। পুরুষ হলে নিশ্চয়ই চাইত সে, কিন্তু মহিলা বলেই, তার থেকে বছর দশেকের বড় একজন নারী বলেই, কে জানে কেন, হয়তো-বা দ্বিধাতেই, সে চাইতে পারেনি ছবি। তা হলে জানল কীভাবে, ক্যারোল তার চেয়ে বছর দশেকের বড়? কেননা, উইকিপিডিয়ায় ক্যারোলের অনুবাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে একটা ছোট্ট পেজ আছে, কিন্তু তাতে ক্যারোলের ছবি নেই। নিশ্চয়ই ক্যারোল নিজেই রাখতে দেয়নি, তাই নেই। এমনকী, গুগল ইমেজেও, সব মিলিয়ে তেত্রিশ জন অ্যাকাডেমিশিয়ান ইংরেজ ক্যারোলের ছবি পেয়েছে সে। উইকি-তে আছে বরং একটা অনুবাদগ্রন্থের ছবি, যাতে ক্যারোলের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। আর এও লেখা, অনুবাদক হিসেবে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছে বছর সাঁইত্রিশের এই ক্যারোল, যে নাকি এখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। ইংরেজি ছাড়া তার প্রিয় দু'টি ভাষা— ফরাসি ও বাংলা। অবশ্য, বাংলা না হলে তার সঙ্গে সম্যককে জুড়ে দেওয়ার কথা ভাবতেনই-বা কেন ফেস্টিভালের আয়োজকেরা?

খুব স্বাভাবিকভাবেই, কেমব্রিজের নামটা দেখার পর মনে মনেই ক্যারোলের থেকে একটু দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছিল সম্যক, কেননা কেমব্রিজে পড়ানো মানুষ নিশ্চয়ই এমনিতেও তাকে বিশেষ পাত্তা দেবে না। সে অবশ্য ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে, সোনার একখানা পদকও তার বাড়িতে আছে, কিন্তু সেরকম প্রতি বছরেই কেউ না-কেউ হয় বলে, সে, ব্যাপারটাকে ততখানি গুরুত্ব দিয়েও দেখতে চায়নি। গবেষণা শেষ করেছে বছর দুই আগে এবং যে-কবির কবিতাকে ঘিরে, কিছুটা হয়তো-বা জীবনকে ঘিরেও তার গবেষণা, তাঁর অনেক অনেক কবিতা, ভালবেসেই, অনুবাদ করে গিয়েছে সম্যক। এক সময়ে দিনের পর দিন, ভূতগ্রস্তের মতোই পড়ে থেকেছে সেই কবির কবিতার বইয়ে মুখ গুঁজে। আর অজস্র কাটাছেঁড়ার উলগোল্লা ছাড়িয়ে বুনে তুলেছে একের পর এক সোয়েটারের মতো কবিতা। আসলে অনুবাদ। প্রকাশক জুটতে অসুবিধে হয়নি। কলকাতারই সংস্থা, কিন্তু ইংরেজি বই ছেপে তারা বেশ নাম কুড়িয়েছে এদিক-ওদিক, এমনকী দেশের বাইরেও পৌঁছেছে তাদের নাম। তারাই, সত্যি বলতে কী তারাই সম্যককে জুড়ে দিয়েছে হে ফেস্টিভালের মতো বিখ্যাত একখানা সাহিত্য উৎসবে, এমনিতে সে যেখানে পৌঁছনোর কথা ভাবতেও পারত না।

সম্যকের করা ব্রিটিশ সেই কবির ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ এবং তারই সঙ্গে তার গবেষণাপত্রের অংশবিশেষ পাঠানো হয়েছিল কর্মকর্তাদের কাছে, তাঁরা সামান্য দেরি না-করেই সম্যককে আমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁরাই, ই-মেলে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন সেই ক্যারোলের সঙ্গে, যে ইতিমধ্যেই অধ্যাপক এবং অনুবাদক হিসেবে পশ্চিমের সাহিত্যিকদের নতুন বিস্ময় এবং যার সাম্প্রতিকতম কাজ এক বাঙালি কবির সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদ। দু'জনের অগোচরে এই যে ভাষা বিনিময় হয়েই আছে কোথাও একটা, এই যে দু'প্রান্তের কবিতার আদানপ্রদান সাজানোই আছে আসলে পাতায় পাতায়, এই যে দুই প্ল্যাটফর্মে উলটোমুখে ছুটতে থাকা দু'টি ট্রেনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, তা আসলে মিলিয়ে তো দিতেই তাদের, নিশ্চিত এইরকমটাই ভেবেছেন কর্মকর্তারা। কোনও না-কোনও স্টেশনে তো দু'দিক থেকে এসে দাঁড়াবে ভাষান্তরের এই দুই যান, হাঁপ ছাড়বে, ধোঁয়া বিলোবে, তারপর আবার দৌড়বে। হে ফেস্টিভাল, তাদের সেই দেখা হয়ে যাবার স্টেশন, যার স্থানাঙ্ক ছোটরা অঙ্ক কষে আবিষ্কার করে থাকে রোজ।

কিন্তু দেখা মোটেই হচ্ছে না যে আজ দেড়দিন হল, এইটা নিয়েই সম্যক এখন এতখানি দুশ্চিন্তায় আছে যে, সে টের পাচ্ছে, এই জুন শুরুর শিরশিরে শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়েও তার গরম লাগছে, অল্প ঘাম দিচ্ছে। ওয়েলস-এর রাজধানী কার্ডিফে এক রাত কাটিয়ে গতকাল দুপুরেই সে এসে পৌঁছেছে হে অন ওয়াই শহরে, নাম লিখিয়েছে ফেস্টিভালের খাতায়, নিজের নাম-লেখা আর দেশের নাম-পতাকা চিহ্নিত কার্ড তুলে নিয়ে কেমন আশ্চর্য আরামে ঝুলিয়ে নিয়েছে গলায়, যেন তার সেই কয়েক বছর আগে পাওয়া স্বর্ণপদকের চেয়ে এতে আয়েশ ও গৌরব কিছু কম নেই। প্রত্যেকের গলাতেই ঝোলানো আছে ওরকম, সবুজ রেশমি সুতোর মধ্যিখানে হে ফেস্টিভালের চিহ্ন দেওয়া কার্ড, তাতে নিজের আর দেশের নাম সুন্দর হরফে ছাপানো, সেইসঙ্গে ছোট্ট করে যার যার দেশের পতাকা। আর সেই কারণেই ছুটন্ত, হেঁটে আসা, দাঁড়িয়ে থাকা, হেলান দিয়ে বসে থাকা বা দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়া প্রত্যেক মহিলার, বিশেষ করে যাদের দেখে বয়সে নিজের চেয়ে একটু বড় বলেই মনে হচ্ছে, সেইসব মহিলার বুকের দিকে আড়চোখে একঝলক তাকাতে তাকাতেই ঘেমে উঠছে সম্যক, যদি সেভাবে নামটুকু পড়ে নেওয়া যায়।

এভাবে অনেকগুলো নামই সে পড়তে পেরেছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ক্যারোল নয়। ক্যারোলকে আবিষ্কার করার আগে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে সে বিলক্ষণ, কেননা মিনিট দুয়েক আগেই কোণের দিকে দাঁড়িয়ে কফিতে-চুমুক-দেওয়া এক যুবতীর নাম পড়ছিল সে, যে-নাম লেখা ছিল গলায় ঝোলানো কার্ডে এবং যে-কার্ড অবস্থান করছিল সেই যুবতীর বিভাজিকা শুরু হবার বেশ কিছুটা নীচে। সম্যক সেই অযাচিত আহ্বান এড়িয়ে নেহাত সৎভাবে নামটাই পড়ার চেষ্টা করছিল যখন, মনে হল যুবতী কটমট করে একবার তাকালেন। আর তখুনি 'চোখে যেন কী পড়েছে' এমন ব্যর্থ অভিনয়ে ব্যস্ত হয়ে মুখ ঘোরানো সম্যক সিদ্ধান্ত নিল, আর এভাবে নয়, ফেস্টিভালের অফিসে গিয়ে খোঁজ করতে হবে ক্যারোলের। জানাতে হবে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সম্যকের সঙ্গে তার দেখা হওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে তাদের পরশুদিনের সেশনটা ভালভাবে হতে পারে। অবশ্য এও হতে পারে যে ক্যারোল, নিজের ব্যস্ততা সামলে আজ বা হয়তো কাল এসে পৌঁছচ্ছে এ শহরে।

এইরকমটা ভেবে সে সবে এক পাক ঘুরেছে, কেননা অফিসের দিকে যেতে হলে তাকে এই লেখক চত্বর থেকে বেরোতেই হবে, যার দরজা ঠিক তার পিছনদিকে, আর ঘোরামাত্রই প্রায় গায়ে গা লেগে ধাক্কা খেতে খেতে সামলে নিয়েছে খুব জোর, আর যার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে সামলেছে, কালো শরীরচাপা পোশাকের উপর খয়েরি ওভারকোট পরিহিতা, লালচে বাদামি আর সোনালি মেশানো টানটান করে ঘোড়ার-লেজ-বাঁধা চুলের অধিকারী সেই বিলিতি মানুষটি, যাকে বয়সের হিসেবে যুবতী বলা না-গেলেও দেখে সাঁইত্রিশের মহিলা বলে বোঝবার বিশেষ উপায় নেই, কেননা তার চোখে গাম্ভীর্যের বদলে উঁকি দিচ্ছে নীল কৌতুকের মণি আর ফরসা মুখে জুড়ে আছে ঝলমলে হাসি, যা নাকি লিপস্টিকের ছোঁয়াহীন পাতলার-চেয়ে-একটু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি-আয়তনের ঠোঁটের পরিখা দিয়ে ঘেরা এখন, আর যার তাকানো দেখেই বলে দেওয়া যাচ্ছে যে, এর মধ্যে মেশানো আছে কাঠবেড়ালির অস্থিরতা, কবরখানার ধৈর্য, মোটরগাড়ির মেধা এবং বাতাসের সারল্য, সেই মানুষটির হাত থেকে কফির গরম কাপ উপচে কফি, কালো গাঢ় কফি প্রায় তার বাদামি ওভারকোটকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল আর কী, দিতও, যদি-না মেয়েটির উপস্থিত তৎপরতা ব্যাপারটাকে লহমায় সামলে নিতে পারত। সে-মেয়েটি অবশ্য এতে মোটেও ক্ষুব্ধ হল না। বরং একগাল হেসে নিজেই 'সরি' শব্দটা যে-গলায় উচ্চারণ করল, তাতে ধূমপানের প্রভাব স্পষ্ট। তারপর যেটা করল, সেটা একটু অবাকই করল সম্যককে। যদিও সে জানে যে, এদিককার মানুষ খুবই সৌজন্যময় হলেও, একটু খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করতে তাদের অসুবিধে নেই।

মেয়েটি, সটান সম্যকের বুকে ঝোলানো কার্ডখানা তুলে ধরে নামটা পড়ে সামান্য হেসে বলল, "তুমি সম্যক? তোমাকে তো আমি সেই সকাল থেকে খুঁজছি। ন'টা নাগাদ এসে পৌঁছেছি। তারপর থেকেই। তুমি ছিলে কোথায়? যাই হোক, দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল। আমি ক্যারোল।"

এই বলে সে, মানে এবারে ক্যারোল, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে, কিছু বোঝার আগেই সম্যক টের পেল, তার ডান হাতের পাতা ক্যারোলের ডান হাতের পাতা থেকে কফিকাপের উষ্ণতা শুষে নিচ্ছে। আর সেই ফাঁকে, এবারও, নিজের অজান্তেই, সম্যক তাকিয়ে ফেলেছে খয়েরি ওভারকোটের দরজা ফাঁক-হয়ে-থাকার দিকে, ক্যারোলের শরীরচাপা পোশাকের দিকে, তার বুকের দিকে। ব্যাপারটা যতক্ষণে বুঝেছে সে, ততক্ষণে ক্যারোল বলছে, "প্রথম দেখাতেই বুকের দিকে তাকাচ্ছ যে? মতলব কী তোমার? যদিও, মিথ্যে বলব না, ভালই লাগে কেউ তাকালে।"

বলে সে নিজেই আর-এক দফা হেসে উঠে কফিতে চুমুক লাগাচ্ছে যখন, সম্যক কুণ্ঠায় কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। একটা নাগাদ নিল গেমন-এর সেশন আছে, লেখক চত্বরও আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে এসেছে তাই। কফি শপের মেয়ে দু'টি একটু হাঁপ ছেড়ে বসেছে, তাদের হাতেও এবার কফির কাপ। আরও একটু মেঘ করে এসেছে। কারণ, শামিয়ানার ভেতরের সাদাটা নিভে এসেছে অনেকখানি, পায়ের নীচের কার্পেটের সবুজখানাও বেলা একটার তুলনায় মনমরা। দু'-তিন জন কর্মকর্তার ব্যস্ত যাতায়াত ছাড়া এক্ষুনি এই শামিয়ানায় তেমন কিছু ঘটছে না আর।

"আমি, আসলে, ওভাবে তাকাতে চাইনি, অত্যন্ত লজ্জিত আমি। আসল কথা কী, আমিও সকাল থেকে তোমাকে খুঁজছিলাম। অফিসে খোঁজ করিনি যদিও, এখন মনে হচ্ছে সেটা করলেই হত। কার্ডগুলো দেখছিলাম, যদি তোমার নাম দেখা যায়। এতবার লজ্জার এই কাজটা করেছি যে, তুমি নিজের নাম বলবার পরও কার্ড আছে কি না, এই ভেবে তাকিয়ে ফেললাম। কিছু মনে কোরো না।"

"আমি বুঝতেই পেরেছি। এত লজ্জা পাবারও কিছু হয়নি। মেয়েদের বুকের দিকে খামোকা কার্ড দেখার জন্য তাকাবে কেন? বুক দেখার জন্যই তাকাবে।"

কফির কাপটা শেষ করে টেবল-এ নামিয়ে রাখল ক্যারোল। এমন রসিকতা, সত্যি বলতে কী, কেমব্রিজের বিলিতি অধ্যাপকের কাছ থেকে, তাও আবার প্রথম আলাপেই, একেবারে আশা করেনি সম্যক। যদিও সে বুঝল, এর সঙ্গে সেই দূরত্ব রেখে কথা বলবার দরকার হবে না। সেটুকু আঁচ মানুষ মানুষকে প্রথম সাক্ষাতেই দিয়ে দেয় বলে তার ধারণা। বছর সাতেক আগেকার একটা মজার ঘটনা এই সূত্রে মনে পড়ে যেতে সম্যক বলল, "জানো, একবার আমাদের ওখানকার ফেস্টিভালে ফরাসি ছবির ভাল প্যাকেজ এসেছে। টানা সাতদিন ধরে দেখছি, দিনে দুটো কি তিনটে ফরাসি ছবি। মিথ্যে বলব না, সেই প্রথম বুনুয়েল দেখা। সে যাই হোক, দেখছি মানে, সঙ্গে সঙ্গে সাবটাইটল-ও তো পড়ে যেতে হচ্ছে। না হলে আর বুঝব কী করে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও, দ্বিতীয় দিন দেখলাম কায়দাটা বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছে। দৃশ্য দেখার ফাঁকেই কখন যেন চোখ, নিজের অজান্তেই প্রায়, পড়ে ফেলছে ফরাসি সংলাপের ইংরেজি সাবটাইটল। ব্যাপারটা যখন পারদর্শিতার জায়গায় পৌঁছল, তখন, ফেস্টিভালের শেষ দিন, ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখানো হচ্ছে। তুমি ঋত্বিকের নাম শুনেছ?"

সামান্য ভয় নিজের মধ্যে চেপে রেখে ক্যারোলকে প্রশ্নটা করল সম্যক।

"তুমি বলতে চাইছ, ঘটক? 'তিতাস, দ্য স্টোরি অফ আ রিভার'-এর পরিচালক?"

চাপা আনন্দের পরদাটার উড়ে যাওয়া নিজের মধ্যেই চেপে রেখে, ক্যারোলের এই জানাটুকুকে পৃথিবীর স্বাভাবিকতম ঘটনার ছদ্মবেশ দেখিয়ে সম্যক বলল, "হ্যাঁ, তিতাস। তা সেইদিন তিতাসেরই শো ছিল। ছবি শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা পরে আবিষ্কার করলাম, আমি সাবটাইটল পড়ে চলেছি। অথচ ছবিটা কিন্তু বাংলাতে। আমার নিজের ভাষায়। ভাবো একবার!"

ক্যারোল ততক্ষণে বাদামি সোফার এক কোণে বসেছে আয়েশ করে, সম্যক দাঁড়িয়ে।

"আসলে কী জানো সম্যক, অভ্যেস। সাবটাইটল-ও একটা অভ্যেস। মজার ঘটনা, সন্দেহ নেই। তুমি তা হলে আমার সাবটাইটল পড়তে চাইছিলে, বলো? ওটা আমার আসে না। ওই নামের প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো। তুমি চাইলে পাসপোর্ট দেখাতে পারি, সঙ্গেই আছে।"

"আরে, এ কী কথা! আমি নেহাত ঘটনাটা তোমাকে বললাম। প্রমাণ চাইছি না। আমার গলায় সম্যক ঘোষাল লেখা আছে মানেই যে আমিও সেই, তারই-বা কী প্রমাণ? ওসব থাক। তুমি নিল গেমন শুনতে গেলে না?"

"চুপিচুপি বলি, আমার ভাল লাগে না ওঁর লেখা। এখানে কাউকে বলা যাবে না সেটা। তার চেয়ে চলো এক কাপ করে কফি খাই। এই কাপটা শেষের দিকে ঠান্ডা হয়ে এসেছিল।"

কফি মেশিনের এই আওয়াজটা কানে লাগলেও, তার সঙ্গে বেরিয়ে আসা তরতাজা কড়া গন্ধের রং সবকিছুকে ম্লান করে দিয়ে যায়। সম্যককে দেখে হয়তো-বা বোঝাও যাচ্ছে যে সে নিজেদের সেশন নিয়ে, পৃথিবীর নামকরা একখানা ফেস্টিভালে নিজের সেশন কেমন হবে তা নিয়ে, বেশ উদ্বেগে আছে। অন্তত ক্যারোল তাকে দেখে এ কথা বুঝতে দেরি করেনি।

"চিন্তা কোরো না। আজ আর কাল সন্ধেবেলা অল্প করে বসে নেব আমরা, তা হলেই হবে। অনুবাদগুলো তোমার ওঁরা পাঠিয়েছিলেন আমায়। বড্ড ভাল। কোন বই থেকে পড়বে, ঠিক করেছ?"

"আমার মনে হয় 'এরিয়েল'। ওর চেয়ে ভাল সংগ্রহ সিলভিয়া-র আর আছে কি?"

"তা যা বলেছ। আশ্চর্য বই। যদিও নানা সংস্করণ আছে, কিন্তু সে যা হোক। ভাল। 'এরিয়েল' আমারও খুব প্রিয় বই। সিলভিয়া প্লাথকে স্পষ্ট চেনা যায়।"

"আমি আমার সাধ্যমতো অনুবাদ করেছি। দেখা যাক, এখানে শ্রোতাদের কেমন লাগে। যদিও বাংলা কেউ তেমন বুঝবেন না। কী মনে হয় তোমার?"

"না বুঝুক। ইংরেজি তো সকলেই বোঝে। তারা সকলে সিলভিয়ার কবিতা বোঝে বলে তোমার ধারণা? কবিতার সবটা তো ভাষা দিয়ে হয় না। হলে অনেক কিছুই হত।"

দু'খানা কাগুজে কাপের মধ্যে কালো আর গাঢ় তাজা কফি, তাদের সুগন্ধী ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে আর মিশে যাচ্ছে ওয়েলশ বর্ষাকালের মিইয়ে আসা রোদ্দুরের দুপুরবেলার শামিয়ানায়। শান্ত হয়ে, ক্যারোলের মুখোমুখি বসে আরও একখানা প্রশ্ন করল সম্যক।

"আমারও জিজ্ঞেস করা হয়নি তোমাকে। আলাদা কোনও বই বেছে এনেছ কি? নাকি অনেক বই থেকে মিলিয়ে মিশিয়ে পড়বে?"

"অনেক বইয়ের দরকার নেই। একটা বই থেকেই গোটা দশেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদ এনেছি। ওইটাই যথেষ্ট।"

"কোন বই?"

"যেটা ওঁর শ্রেষ্ঠ বই বলে আমি মনে করি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।"

তিন

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

তারা বেরিয়ে পড়েছে দুপুর-দুপুর লাঞ্চ না-সেরেই হে ফেস্টিভালের ঝলমলানো চত্বর ছেড়ে আর শামিয়ানা-সকলের সামনে দিয়ে চওড়া যে-রাস্তা অল্প বেঁকে একটু দূরেই নেমে যাচ্ছে ছোট্ট এই নদীকেন্দ্রিক শহরের ডাউনটাউনের দিকে, সেই রাস্তায় একে অন্যের পাশে অল্প অবিন্যস্তভাবে, ঠান্ডা হাওয়ার মোকাবিলা করতে করতে পাশাপাশি অন্যমনস্ক হাঁটা লাগিয়েছে সম্যক আর ক্যারোল। তাদের ডান দিকে এখন আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকা ফেস্টিভাল চত্বর আর বাঁয়ে একের পর এক সার বেঁধে দাঁড়ানো ছোটখাটো সব অস্থায়ী দোকানের ঝাঁক। বছরের অন্য সময়ে এরা এখানে থাকে না। কিন্তু ফেস্টিভালের দিনকতক এইসব ছোটখাটো দোকানের উড়তি ব্যবসা নেহাত মন্দ হয় না। তারা তাই পেরিয়ে যাচ্ছে একটা কাঠের গয়নার দোকান, একটা বাগান-ক্যাফে, একটা কুকি আর কেকের দোকান, কাপড়ের থলে আর ঝোলাব্যাগেরও দোকান একখানা। ক্যারোল লক্ষ করছে ওদিককার এক বাড়ির পাঁচিলে বসে থাকা এক খয়েরি-ছোপ বেড়ালকে, যার মতিগতি বোঝা ভার, আর সম্যকের মাথায় অনেকদিন ধরে সাদামাটা অথচ রহস্যময় উত্তরের অপেক্ষাকারী যে-প্রশ্ন লুকিয়েছিল, সেইটা ঘুরছে। তাই সে ক্যারোলকে জিজ্ঞেস করে বসল হঠাৎ করেই—

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে গতকাল রাতেই। ওয়েলস সামান্য উপর দিকে বলে, আর বেশ কিছুটা খোলামেলা বলেও, এখানে শীতলতা ছড়ায় বেশি এবং দ্রুত। এখনই এদিক-ওদিক ছড়ানো ফাঁকা জমি আর বিশাল সব মাঠ ঠেলে মেঘের পাশাপাশি নেমে আসছে ঘন কুয়াশা, যেন সাদা ধোঁয়া দিয়ে তৈরি শাড়ি মেলতে এসেছে অদৃশ্য কেউ। আর সেইসঙ্গে এ-গলি সে-গলি দিয়ে ফুটবল পায়ে হুট করে বড়রাস্তায় বেরিয়ে পড়া বেখেয়ালি বিচ্ছু ছেলেদের মতো বেরিয়ে আসছে সামান্য কনকনে, সরু আর কমবয়সি একটা হাওয়া। ক্যারোলের লালচে সোনালি-বাদামি ঝুঁটি সেই হাওয়ায় উড়ছে, আর সম্যকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। মেয়েলি রুমালের আকার নিয়ে। যখন সে জিজ্ঞেস করছে—

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

শহরটায় তেমন কোনও লম্বা বা বড় বাড়ি নেই। নেই কোনও নতুন তৈরি হওয়া চমকদার স্থাপত্যও। সবই যেন বেশ পুরনো, যেন তারা নতুন সমস্ত কিছুকেই বেশ দূর থেকে এক স্নেহের দৃষ্টিতে আদুরে তাচ্ছিল্য করবার মতলব নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু বছর থেকে। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়ে বাঁয়ে ঘুরছে, সেখানে দু'দিকে বেশ সব বাড়িপত্তর, যাদের টালির ছাদে চৌকোনো চিমনি অপেক্ষা করে আছে ফায়ারপ্লেসে আগুন লাগবার আর যাদের অনেকেরই গা বেয়ে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে ঝকঝকে ছোট গুল্মগুচ্ছ, যার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে আছে কাচের জানলা। এতই ছোট শহর যে, নিজের গাড়ি ছাড়া এদিক-ওদিক যাতায়াতের বিশেষ কোনও ব্যবস্থাই নেই। ফেস্টিভালের খাতিরে একটা-দুটো শাটল বাস অবশ্য চলছে এই ক'দিন, খেয়াল করে দেখেছে সম্যক। তবে তাতে চালকের আসনে একজন ছাড়া বেশির ভাগ সময়েই কোনও মানুষ নেই। কেননা, মানুষ হাঁটছে। শহরের শরীর বেয়ে, সমস্ত রকম চড়াই-উৎরাই ভেঙে, নানান স্বাদের উঁচুনিচু ঢাল পেরিয়ে, একটা-না-একটা ঝোলা কাঁধে, কত-না রঙের ছাতা মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁটছে। সম্যকের পাশেও এখন তেমনই একজন হাঁটার সঙ্গী, যাকে সে জিজ্ঞেস করছে—

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

ডাউনটাউন সত্যি সত্যি শুরু হচ্ছে যেখান থেকে, সেখান থেকে বেশ কিছু সরু লম্বা রাস্তা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হে অন ওয়াই শহরটার নামডাক আছে চারপাশে, বহু বইয়ের দোকানের খাতিরে। এত ছোট শহরে গায়ে গা লাগিয়ে এত বইয়ের দোকান একসঙ্গে, খুব তো দেখা যায় না কোথাও। আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই পুরনো বইয়ের দোকান। ধুলোপড়া, বাতিল হওয়া, বহু বছর নেড়েচেড়ে না-দেখা, ঘুমিয়ে পড়া, অবসরপ্রাপ্ত সব বই। চাই কি তাদের মধ্যে দু'-একটা প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে পড়তেও পারে হঠাৎ, যদি খোঁজা যায় মন দিয়ে। অন্য কোনও শহরে গিয়ে এত আরাম কোনও দিন পাবে কি না জানে না সম্যক, কেননা চোখ বুজে দশটা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়া যায় যদি, তাদের মধ্যে ন'খানা দরজাই পুরনো বইয়ের ছোট-ছোট দোকানের। হয়তো তাই এই শহরের হাওয়ায় সারাক্ষণ একটা হলদে পাতা মুড়ে রাখার গন্ধ ভেসে বেড়ায়, সে খেয়াল করেছে। আর সেই গন্ধের মধ্যেই, আজ দুপুরে, ক্যারোলের দিকে সে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার প্রশ্ন—

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

তারা এখন হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তাদের গা ঘেঁষে নানা দিকে সানন্দে ছিটকে যাচ্ছে লোকজন। গোল চত্বরটার ঠিক মাঝখানে একখানা গির্জা, সে নিজেও খুব বেশি লম্বা নয়, তবে হ্যাঁ, প্রাচীন বটে। তার চেহারাতেও একখানা পড়ুয়া ভাব, একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই, দিব্যি খেয়াল করা যায়। গির্জার গা ঘেঁষে একটা সরুমতো রাস্তা নেমে গিয়েছে নীচের দিকে, যার গায়ে-বসানো ফলক বলছে, এই হল ওয়াই নদী পর্যন্ত পৌঁছনোর রাস্তা। খুব অল্প চওড়া, কিন্তু ভরাট হয়ে শান্ত বয়ে চলা এই ওয়াই নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে হে শহর, তাই তার এমন নাম। ওয়াই-এর উপরে হে। হে অন ওয়াই। মজার নাম, মনে হয়েছিল সম্যকের, প্রথমবার শুনেই। যদিও তার একবারও যাওয়া হয়নি নদীটার দিকে, কিন্তু কালকের মধ্যেই একবার সময় বের করে ওদিকটায় হেঁটে আসতে হবে যে, এটা সে একরকম স্থির করেই ফেলেছে। অন্যমনস্ক, এলোমেলো, আপনমনে হাঁটার এই মানুষটিকে নদী-দেখার সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া যাবে কি? এত দূরের প্রশ্ন সে করতেই পারছে না, কেননা আপাতত সে ক্যারোলকে জিজ্ঞেস করছে অন্য একটা প্রশ্ন—

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

এখানে বইয়ের দোকানের পাশাপাশি সব্জির দোকান, মুদিখানা, ঠান্ডা মাছ-মাংসের ঠেক, সবই জড়ামড়ি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। আর সব দোকানেই ছোটখাটো খদ্দেরদের ভিড়। তবে রেস্তরাঁর সংখ্যা বড় একটা কম নয়। তেমনই এক মাঝারি টিমটিমে রেস্তরাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ক্যারোল আর সম্যক, যখন সম্যকের সোজাসুজি তাক করা দৃষ্টি হঠাৎ তরল হয়ে গেল, আর প্রাচীন সেই গির্জার দরজার নীল রং গলে পড়তে থাকল বেমালুম। বৃষ্টি। প্রথমে এক ফোঁটা দু'ফোঁটা, তারপরে ঝিরঝির। যাকে এঁরা শৌখিন ভাষায় আদর করে ডাকেন ড্রিজ়ল, সেই জিনিস। এতে বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু ভালভাবে ভিজে যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না। আর সেটা এই মুহূর্তে কিছুতেই চাইছে না সম্যক। বেকায়দায় কোনওরকমে ঠান্ডা লেগে গেলে পরশুর সেশনটা আরও ঝামেলার হয়ে উঠবে, এটা সে ভালই জানে। সুতরাং ক্যারোলকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ইশারা করে অনুরোধ জানাল, এবং ক্যারোলও রাজি হল পাশের রেস্তরাঁটায় ঢুকে পড়তে। ঢুকে সম্যক বুঝতে পারল, এই মহিলার কফিপানের ক্ষমতা অপরিসীম, কেননা ক্যারোল আবারও একটা কড়া ঘন কালো কফির অর্ডার রাখল। সম্যক একটা চা বলে টেবল-এ বসল। আবার সে আর ক্যারোল মুখোমুখি। ক্যারোলের গাল থেকে পাকা গমের রং গলে গলে নামছিল। ব্যাপারটা অসহ্য, তাই চশমা খুলে তার দিকে তাকিয়ে সম্যক জানতে চাইল—

"তুমি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলে কীভাবে?"

"যেভাবে অনেক দূরের রাস্তা পার করে মোটেলে রাত কাটাতে আসা মানুষ হঠাৎ বিছানা আবিষ্কার করে।"

চেয়ারে আরামের হেলান দিয়ে উত্তরটা বলল ক্যারোল। বলে, সম্যকের দিকে তাকিয়ে যখন বুঝল যে, এরকম আশ্চর্য কাব্যিক উপমার আশা সে কখনওই করেনি, তখন একটু হেসেই ফেলল।

"ইন্টারভিউতে কেউ এসব জিজ্ঞেস করলে আগে যেমন উত্তর দিই, সেটাই তোমাকে দিয়ে দেখলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, তোমার ক্ষেত্রে এই উত্তরগুলো কাজ করবে না একেবারে।"

"এটুকু বুঝতে পারার জন্য ধন্যবাদ।"

একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল সম্যক, "তুমি একেবারেই কিছু না-ও বলতে পার আমায়, তার প্রয়োজনও তো নেই। এই সেশনটা করার জন্য এসব না-জানলেও আমার চলবে। আর সেশনটার পরে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে মনেও রাখবে না। আমার কৌতূহলের জন্য আমাকে মার্জনা কোরো। আমি কেবল ভেবেছিলাম, এসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের যদি আরও একটু জেনে নেওয়া যেত। কিন্তু তারও তেমন দরকার নেই।"

ক্যারোলের বন্ধ-ঠোঁটের পরিখা চওড়া হয়ে সরে গেল, "তুমি বাড়িতে খুব আদরে মানুষ, তাই না?"

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"কিছু না, এমনি," বলে, কালো কফিটায় একটা চুমুক দিল ক্যারোল। তারপর বলল, "সত্যি বলতে কী, বাবার কাছ থেকে। বাবা-ই আমার পড়াশোনার যাবতীয় পৃথিবী তৈরি করে দিয়েছিলেন। মাকে হারিয়েছি খুব ছোট বয়সে, তাঁর কথা বিশেষ মনেও নেই। কিন্তু বাবা, সেই সময় থেকেই, আমার চারপাশ ঘিরে দিয়েছিলেন বই দিয়ে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় ছিল না। বিজ্ঞান হতে পারে, আবার ইতিহাসও হতে পারে। প্রবন্ধও হতে পারে, হতে পারে কবিতাও। কিন্তু বাবার পড়া হয়ে যাওয়া মানেই সেই বই আমার সম্পত্তি হয়ে যাওয়া। বড়-ছোটর ভাগ ছিল না, কোনও বই পড়তে বাধা ছিল না কোথাও। যেন আমি আর বাবা সমবয়সি দু'জন বন্ধু। সব বিষয়ে, সব বইয়ে আমাদের দু'জনের সমান অধিকার। এইভাবে পড়তে পড়তেই বড় হলাম। আর বাবা রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে, ডিনার রান্না করে আমার সঙ্গে গল্পে বসতেন। আমরা তখন থাকতাম অক্সফোর্ডের একটা ছোট্ট কটেজে, চারপাশটা ভারী নিরিবিলি ছিল তাঁর। বাবা তখন পড়াতেন অক্সফোর্ডে। কেমব্রিজেও ওঁর একটা চেয়ার ছিল। আর গ্রীষ্মে হার্ভার্ড যেতে হত। সেই সময়টা আমি একা একাই বই পড়ে কাটিয়ে দিতাম, মাঝেমধ্যে পাশের বাড়ির দম্পতি আমার দেখভাল করতেন। কিন্তু সেইসব সময়েও, মানে যখন বাবা নেই আশপাশে, আমি বই ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বলে ভাবতে পারিনি। সে-কারণে চারপাশে আমার মেলামেশা একটু কম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই দ্যাখো, কেমন জীবনানন্দের কবিতা পেয়ে গিয়েছি!"

এতখানি বলে, কফি ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার ভয়ে ফের চুমুক বসাল ক্যারোল।

"খুব অন্যরকম ছোটবেলা তোমার।"

মন থেকেই কথাটা বলল সম্যক। শুনে অল্প একটু হাসল ক্যারোল, পরিখা বন্ধ রেখেই।

"বাবার মতো পড়ুয়া, মনখোলা মানুষ আমি দুটো দেখিনি। নতুন কোনও বইয়ের প্রতি বাবার ভালবাসা আর আগ্রহ ছিল দেখবার মতো। কত কত লেখকের সঙ্গে যে মত বিনিময় আর তর্ক চালিয়েছেন চিঠিচাপাটিতে, তার হিসেব নেই। তাঁরাও অবশ্য বাবাকে, কেবল একজন অধ্যাপক বা অনুবাদক নয়, একজন পণ্ডিত বলেই খাতির করতেন। চিঠিচাপাটি তো তুচ্ছ ব্যাপার, এক-আধটা বইয়ের জন্য বাবাকে কত দূরে দূরে পাড়ি দিতে দেখেছি একসময়ে...। আসলে আমার ছোটবেলাটা নয়, বাবার বড়বেলাটা অন্যরকম ছিল। নিজের কাজ আর পড়াশোনার বাইরে, আমার দেখভালের পাশাপাশি একের পর এক বই অনুবাদ করে যেতে দেখেছি অক্লান্ত বাবাকে।"

"উনি কি জীবনানন্দের কবিতাও..."

"হ্যাঁ, বাবার বইয়ের র‍্যাকেই প্রথম দেখি বাংলা ভাষার বই। বাবা পাঁচটা বিদেশি ভাষা মাতৃভাষার মতো করেই বলতে আর লিখতে পারতেন। স্প্যানিশ, রাশিয়ান, ইতালিয়ান, ফরাসি আর বাংলা। এইসব ভাষার সাহিত্য ছিল তাঁর ডুবে থাকবার রসদ। আর তিনি ছিলেন জীবনানন্দের অন্ধ অনুরাগী। আছেন অবশ্য এখনও। আমার যখন সতেরো কি আঠারো বয়স, বাংলা শিখিনি তখনও, বাবা পড়ে শোনাতেন তাঁর অনুবাদে জীবনানন্দের কবিতা। 'মহাপৃথিবী', 'বনলতা সেন', 'সাতটি তারার তিমির'... সব। আর আশ্চর্য ঘোরলাগা সেইসব কবিতা পড়ে শোনাতে শোনাতেই আমাকে বলতেন, ক্যারোল, ইনি হলেন আমাদের সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কখনও পারলে ওঁর নিজের ভাষায় ওঁর কবিতা পোড়ো, তবেই বুঝবে। আমি বাবার ইংরেজি অনুবাদ শুনে ওই ছোট বয়সেই এমন মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, বাংলা শিখতে শুরু করি। বাবা কেবল একখানা বই থেকে কোনও অনুবাদ করেননি। কেন, কে জানে। হয়তো আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই বাড়িয়ে দেওয়ার খেলাটাই বাবার জীবন, আর আমার ছোটবেলা। আর আজ, এই কফিশপে, তোমার সঙ্গে বসে আছি, জীবনানন্দকে নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য। জীবন ভারী আশ্চর্যের, না?"

"তুমি তো তা হলে অনেক বাঙালির চেয়ে বেশি বাঙালি?" আশ্চর্য হয়েই প্রশ্নটা করল সম্যক।

"অতটা নই। এই যে ইংরেজিতে যেভাবে তোমার সঙ্গে কথা চালাচ্ছি, বাংলায় সেভাবে পারব না। আমার বাবা অনর্গল বাংলায় কথা বলে যেতে পারেন, একবারও না-আটকে। উনি তো লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেনও। দীর্ঘদিন পড়িয়েছেন। বাবার মতো বাংলা ভালবাসতে আমি আর কোনও ব্রিটিশকে দেখিনি। সুতরাং এই হল তোমার প্রশ্নের ছোট্ট উত্তর। জীবনানন্দকে আমি পেয়েছি আমার উত্তরাধিকার সূত্রে। এবং, বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আমরা কি এবার হাঁটতে বেরোতে পারি?"

সম্যকের ভালই লাগছিল ক্যারোলের বাবার গল্প শুনতে, এমন মানুষ, সত্যি বলতে কী এমন পণ্ডিত মানুষ হাতে গোনাই থাকেন চিরকাল। নইলে জীবনানন্দের মতো কবি কবেই পশ্চিমে খাতির পেতে পারতেন, সম্যক ভাবে। ভাবে, আর সম্মতি জানায় বেরনোর প্রস্তাবে।

তার সঙ্গে তর্কাতর্কি কাটিয়ে কফি আর চায়ের দাম যখন মেটাচ্ছে ক্যারোল, কার্ডেই মেটাচ্ছে সেই দাম, আর তার পুরো নাম ছাপা বিল বেরিয়ে আসছে মেশিন থেকে, তখন, ক্যারোলের পুরো নাম, পদবিসহ নামটা আবার পড়তে পেরে, একটা আচমকা সন্দেহ, একটা ভাললাগার কৌতূহল তৈরি হচ্ছে সম্যকের মধ্যে, আর তা চেপে রাখতে না-পেরে, দরজা ঠেলে বেরোতে বেরোতেই সে ক্যারোলকে জিজ্ঞেস করছে, "আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করো, তুমি কি কোনওভাবে..."

আর তার প্রশ্ন আঁচ করে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে, সেই আলতো হাসিটা হেসেই ক্যারোল জবাব দিচ্ছে, "হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। আমি উইলিয়ম ব্রাইটের মেয়ে।"

চার

উইলিয়ম ব্রাইটের ঘরখানা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সমুদ্র। ওঁরা বলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইরিশ বে, ম্যাপেও তাই বলে। আসলে ওটা উত্তর সাগর বা নর্থ সি-র একটা অংশ, যা ওয়েলস, বা বলা ভাল উত্তর ওয়েলস-এর গায়ে আছড়ে পড়েছে এসে। ঘন নীল জল, যা এমনকি ভারী গ্রীষ্মেও শীতলতার বোধ জাগিয়ে তুলতে বাধ্য। বিখ্যাত সৈকতগুলো থেকে একটু দূরে থাকা এই সৈকতটির নাম ক্রিকেথ। গোটা অঞ্চলটির নামও রাখা আছে এই বেলাভূমির নামেই। আর ক্রিকেথের সেই জলের ধারে ধারে, উইলিয়ম জানলা বা সামনের বাগান থেকে যতখানি দেখতে পান, বিছিয়ে আছে ধবধবে সাদা বালি। সেই গাঢ় চঞ্চল নীল জল আর বাতাসে সঞ্চরণশীল সাদা বালি পাশাপাশি বসে থেকে থেকে, যুগের পর যুগ ধরে বসে থেকে থেকে যেন নাবিকের পোশাক তৈরি করেছে। সাদা পুরু কিনার-ওড়ানো কলারের নীচে ঘন নীল জামা তার। এইরকম মনে হয় উইলিয়মের, যখন একদিকের দেওয়াল ঘেরা কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকান। তাকান সমুদ্রের দিকে। তাকান বালির দিকে।

এ জায়গাটা উত্তর ওয়েলস-এর একটা পাহাড়ি কোণ বললে বিশেষ ভুল বলা হবে না মোটেই। দক্ষিণ থেকে আসতে গেলে সটান দু'খানা পার্বত্য উপত্যকার মহান ও বয়স্ক কুয়াশাচ্ছন্ন হাইওয়ে পেরিয়ে আসতে হয়। পেরিয়ে আসতে হয় সমতলের মনকেমন ঘিরে রাখা একের পর এক বৃদ্ধ ওক গাছের সারিকেও। তারপর এক সময়ে দেখা যায় দরোজা। উঁচু, চওড়া আর কাঁটাওলা, যেমন আগেকার দিনের অট্টালিকাগুলোয় থাকত। অল্প শব্দ করে সেই দরোজা দু'পাশে সরে গেলে শুরু হয় নুড়ি ফেলা পথ, যার দু'পাশে নিয়মমাফিক পাহারাদার সেজে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু বার্চের দল, যেন তাদের বহুদিনের বেতন আজও বাকি, পেলেই তারা এ পদ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। সেই নিরুৎসাহ, শুকনো বীথি পেরনোর পরই সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠবে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে টানা এই বাড়িগুচ্ছ, যার একটিতে উইলিয়ম আছেন গত চার বছর হল।

এককালে এই সম্পত্তি ব্যবহৃত হত নামজাদা লেখক শিবির হিসেবে, এক সম্ভ্রান্ত ধনী দম্পতি তাঁদের এই পরম স্থাবর সম্পদ দান করে গিয়েছিলেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টকে। তাঁরাই গ্রীষ্মে লেখক শিবির চালাতেন। কিন্তু দিনের পর দিন অলাভজনক সেই কাজকর্মে জড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশ্ববিদ্যালয়টির অর্থনীতি এতখানি দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তাঁরা একটি এনজিও-কে এই সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন, যারা তার পরের বছর থেকেই, অ্যালঝাইমার্স আক্রান্ত বয়স্কদের জন্য হোম শুরু করে এখানে। তা এই পনেরো বছরে বাসিন্দাদের কোনও অভাব ঘটেনি, যা একরকম ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পৃথিবীতে লেখকদের চেয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের সংখ্যা এই মুহূর্তে বেশি হলেও হতে পারে।

তাঁদেরই মধ্যে উইলিয়ম ব্রাইটের পরিচয় একটু অন্যরকম। সারা যুক্তরাজ্য তাঁকে একডাকে তো চেনেই, এমনকী পৃথিবীর নানা প্রান্তে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি যে আছে, সে-ব্যাপারে এই হোমের লোকজন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ফলে এ-কথা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন যে, আর পাঁচজনের চেয়ে তাঁকে নিয়ে এখানকার লোকজন একটু বেশি তৎপর, একটু বেশি যত্নশীল, বা এমনকী একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। যদিও এ নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে, এই হোমের প্রত্যেক বাসিন্দাদের প্রতি তাঁদের ভারী তরিবতি নজর।

চার বছর হয়ে গেল তা হলে? কেটল-এ দার্জিলিং-এর সেরা পাতাটা ভিজতে দিয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন উইলিয়ম। ক্যারোল কিছুতেই চায়নি তার বাবা এমন কোনও হোমে এসে থাকুন, যার ত্রিসীমানায় সে নিজে নেই, থাকতে পারবেও না চাইলে। বরং সে চেয়েছিল, কেমব্রিজে বাবাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে। উইলিয়মই রাজি হননি। স্মৃতিভ্রম ছিল তাঁর কাছে সেই রাস্তা, যার অছিলায় তিনি একা হয়ে যেতে চাইতে পারেন এবং আদরের মেয়েকে দিতে পারেন নিজের মতো বেঁচে নেবার ফুরসত। এই যদি আজ তিনি জুড়ে থাকতেন ক্যারোলের রোজকার জীবনের সঙ্গে, মোটেই সে এভাবে অক্লান্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারত না, এ উইলিয়ম ভালই জানেন। ক্যারোলের মানতে সময় লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন যখন সে দু'মাসে একবার এসে দেখা করে যায় বাবার সঙ্গে, তার ক্লান্ত মুখটাকে তৃপ্ত হয়ে থাকতে দেখে খুশি হন উইলিয়ম।

সবচেয়ে বড় ঘরটাই বরাদ্দ হয়েছে উইলিয়মের জন্য, সেই চার বছর আগে থাকতেই। সব আলাদা আলাদা বাড়ি, সব একতলা। সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরানো তাদের, আর পিছনে সেই ঢালু নুড়ির পথের দু'ধারে পাহারাদার বার্চের দল। ঘরে জিনিসপত্র বিশেষ বাড়াননি উইলিয়ম। একটা বিছানা, একটা লেখার টেবল আর চেয়ার, একটা ডেকচেয়ার আর বাকি বেশ কিছু বুক শেলফ। সেইসঙ্গে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা কাগজ-বই-ডায়েরি-ফাইল তো আছেই আকছার। এরই মধ্যে ছোট্ট এক কোণে চা বানাবার জায়গা। দু'বেলা চনমনে দার্জিলিং না হলে তাঁর চলে না।

"চা কি এক পেয়ালাই বানিয়েছ, নাকি অতিরিক্ত দু'-এক চামচ হয়ে যেতে পারে?"

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে যখন ফুটতে থাকা দার্জিলিং-এর গন্ধ উপভোগ করছিলেন উইলিয়ম আর ভাবছিলেন, কবে সত্যি এরা সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসার অনুমতি দেবে, তখনই শুনতে পেলেন গলাটা। মার্থা এই সময়ে একবার আসেন। বিকেল তাঁর প্রিয় সময়, সারা দিনের মধ্যে। আর এখন বিকেল হলে উইলিয়মের সঙ্গে এক কাপ চা তাঁর বাঁধা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যাকে বলে। বর মারা গিয়েছেন কুড়ি বছর আগে, নিঃসন্তান এবং খুবই ধনী এই মহিলা তারপর বছর দশেক পৃথিবী দেখে বেড়িয়েছেন। শেষমেশ যখন শহরগুলোর নাম কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, নিজের নাম মনে করে লেখালেন এই ঠিকানায়। সেই থেকে তিনি এখানকার বেশ হোমরা-চোমরা একজন বাসিন্দা, যাকে সবাই বেশ খাতির করে। বিশেষত এখানকার কাজের মহিলারা বা রাঁধুনি দুই প্রৌঢ়, কেননা দিনের শেষে দু'চার পাউন্ড বকশিস পেলে এই শুকনো এলাকায় তাদের রাতগুলো মন্দ কাটে না আর কী।

"আমার ঘরে এসে চা পাওনি, এমন এই চার বছরে হয়েছে নাকি, মার্থা?"

"তা অবশ্য হয়নি ঠিক কথাই," স্বভাবসিদ্ধ গলায় হেসে জবাব দিলেন মার্থা।

বেশ গোলগাল চেহারা তাঁর, ফোলা গালের গোলাটে মুখে হাসি লেগেই আছে, সেইসঙ্গে আছে কাঁধ পর্যন্ত ঝকঝকে সাদা সোনালি চুলের গুচ্ছ, যাদের তিনি প্রায়শই আড়াল করে রাখেন শৌখিন সমস্ত টুপি দিয়ে। আর সারা বছর গায়ে চাপান ফ্লোরাল প্রিন্টের পোশাক, শীতে বড়জোর তারই উপর একখানা কার্ডিগান। বিশুদ্ধ ব্রিটিশ বুড়ি বলতে যা বোঝায়, মার্থা এককথায় তা-ই।

সদ্য বাহাত্তর পেরনো উইলিয়মের চৌকো আর শক্ত চেহারার পাশে মার্থাকে তাই একটু বেশি বুড়ি দেখায়, যদিও তিনি বার দশেক হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে, উইলিয়ম তাঁর চেয়ে সাড়ে সাত বছরের বড়। উইলিয়মের গোটা চেহারাটাই চৌকোনো ধরনের, মাঝারি উচ্চতার। সেই কৈশোর থেকেই এমনটা তিনি। চৌকো চওড়া মুখ, স্পষ্ট চোয়ালরেখা, স্থির আর সিধে কাঁধ, চওড়া বুকের মানুষ তিনি। দাড়ি কামিয়ে গালকে সাফসুতরো রাখতেই পছন্দ করেন প্রতিদিন, যদিও ধবধবে সাদা এলোমেলো চুলে চিরুনি চালানোটা তাঁর পছন্দ নয় একেবারেই। ঢোলা শার্ট আর ট্রাউজার্স তাঁর সারা বছরের পোশাক, এবং শীতে, মার্থার মতোই, অতিরিক্ত তোয়াক্কা না-দিয়ে একটি ঢোলা সোয়েটার। ওই পর্যন্তই।

"তুমি নাকি ডক্টর বয়েলের কাছে আমার নামে মস্ত সব নালিশ করেছ?" চা ঢালতে-ঢালতে মজার গলায় প্রশ্ন করলেন উইলিয়ম, যিনি জানেন, একটু পরে রোদের রংও ঠিক এই চায়েরই মতো লালচে সোনালি আর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এখানে। অবশ্য হ্যাঁ, তাতে গোলাপির ভাবটা থাকবে একটু বেশি, যা কিছুতেই এই চায়ের আভায় মিশে নেই।

"নালিশ? তোমার নামে? তা কে তোমাকে বলল এসব কথা?" টুপিটা যে-কোনও প্রাক্তন অভিনেত্রীর ঢঙে ঠিক করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে বললেন মার্থা।

"ডক্টর নিজেই বললেন তো স্পষ্ট। গত পরশুই হবে বোধ হয়, না কি?"

"দেখেছ উইলিয়ম? তুমি কোনও কথাই ঠিকঠাক মনে করতে পারছ না। ওষুধগুলো খাচ্ছ, নাকি একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছ শুনি?"

"মার্থা, ওই কাঁচুমাচু ডাক্তার আমাকে ঠিক কবে দেখতে এসেছিলেন, আমার কি তা মনে রেখে আদৌ কোনও আনন্দ আছে?"

"বাজে কথা দিয়ে আসল কথাটা ঢাকা তোমার অনেক দিনের স্বভাব, এই আমি দেখে আসছি।"

"আসল কথাটাই তো বলছিলাম। তিনি দিব্যি বললেন, তুমি নালিশ করেছ যে, আমি ডিনারও নাকি ভালমতো করি না। তা আমি তো ডিনার করি বেশ রাতের দিকে, আর তখন তোমার ঘুম শুরু হয়ে যায়। তুমি বুঝলে কী করে, আমি ঠিকঠাক ডিনার করি কি না?"

"এই কথা আমি বলেছি বুঝি ডাক্তারকে? দেখেছ! আমার কিচ্ছু মনে নেই!"

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এবারে হেসে উঠলেন দু'জনেই, যখন উইলিয়মের চওড়া ঘরের এক-দেওয়াল কাচের প্যানেল থেকে দেখা যাচ্ছে, সামনের উঁচু টিলার উপর বিছিয়ে থাকা মাঠের ঝকঝকে সবুজ ঘাসগুলোয় কমলা রং নেমে আসছে। দ্রুত নিভতে থাকা বিকেলের।

"আসলে কী জানো উইলিয়ম, এই ডাক্তার বেচারি এখানে কাজকম্মো পায় না তেমন। ওর বউটা ওকে দিনরাত বকে, বলে শহরের দিকে কাজ খুঁজতে, ভাল কোনও হসপিটালে অ্যাপ্লাই করতে, আরও বেশি টাকা রোজগার করতে। তার চেয়েও বড় কথা, ওর বউ রিপোর্টার হতে চায়। তা অন্ততপক্ষে ছোটমোটো একটা শহর অবধি না-পৌঁছলে তাই-বা কী করে হবে? তাই বেচারি ডাক্তার ভারী চাপে থাকে। তো, ওকে একটা ভাববার কারণ দিলাম আর কী। এর বেশি কিছু তো নয়। আশা করি ও নিজেও বোঝে যে, তোমার মতো মহৎ রোগীকে সারাতে ওর জন্ম হয়নি, কী বলো?"

এবারের হাসিটা মার্থার একারই, কেননা উইলিয়ম কাচের টানা প্যানেল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন, আর মার্থার হাসি থামলে বলছেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

এই 'চলো যাওয়া যাক'-এর অর্থ এত বছরে মার্থার ভালই জানা হয়ে গিয়েছে। এ এখন একরকম নিয়মেই দাঁড়িয়েছে যে, বিকেল পড়ে এলে, দু'কাপ গরম চা হাতে ধরে মার্থা আর উইলিয়ম কটেজের সারি ছাড়িয়ে ছোট আর রং-বেরঙের পাথর-পাতা হাঁটাপথ পেরিয়ে, ছোট্ট আর কালো গ্রিলের গেট ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গিয়ে দাঁড়াবেন উন্মুক্ত প্রান্তরে, যা আসলে এই গোটা বসতি আর ব্যবস্থার শেষ প্রান্ত, যা আসলে টিলার চড়াই, যাকে ইংরেজিতে এঁরা ক্রিক বলে ডাকেন। বার্চের পাহারা দেওয়া পথ ধরে যখন গাড়ি ওঠে, তখন তেমন বোঝা না-গেলেও, তার অনেক আগে থেকেই সমতল ছাড়াতে শুরু করে সেই রাস্তা। তাই যখন কেউ কটেজের সামনে পৌঁছন, তিনি আসলে সমুদ্রতল থেকে অন্তত পঁচিশ ফিট উচ্চতায় পৌঁছে যান। সেটা চট করে বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু কটেজের সারি ছাড়িয়ে, ছোট্ট গ্রিলের গেট সরিয়ে চওড়া আর তেকোনা, ঘাসঢাকা এই বাগানটিলায় এলে বহু দূরে আর অনেকটা নীচে আছড়ে পড়তে দেখা যায় সমুদ্রকে।

কটেজ থেকে এই টিলায় পৌঁছনোর পথে, ডান হাতে বেশ কিছু সিঁড়ি নেমে গেলেই একখানা কাচের পোক্ত দরজা, যাকে পার করলেই বেশ জাঁকজমক ব্যবস্থাওলা একখানা হেঁশেল আর তার পাশে লম্বা ডাইনিং হল। দুপুরে আর রাতে অনেকেরই সেখানে দেখা হয়ে যায়, গরম খাবারদাবার সহযোগে। আর এর ঠিক লাগোয়া একটা মিনার মতো উঠে গিয়েছে, মোটামুটি ফিট তিরিশেক লম্বা, ঘোরানো সিঁড়ি ধরে যার গা বেয়ে উঠতে হয়, এবং সেই মিনারের মাথায় আছে একখানা কাচের চওড়া গোলঘর, যেখান থেকে চারপাশের সব কিছু অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই ঘরখানা মূলত লাইব্রেরি, যাতে ওয়েলস-এর আশ্চর্য প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে করতেই এখানকার বাসিন্দারা পছন্দের বইপত্তরের পাতা ওলটাতে পারেন, তবে উইলিয়মের কখনও প্রয়োজন পড়ে না সেই লাইব্রেরির বইগুলোকে। যদিও প্রতি শনিবার বিকেলে তাঁকে একবার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় ওই গোলঘরে, কেননা এখানকার প্রায় প্রত্যেক বাসিন্দা তাঁর কাছ থেকে শিখতে চান। তাই একরকম বাধ্য হয়েই উইলিয়ম, শনিবারগুলোয় একখানা ঘণ্টা দেড়েকের অনুবাদ কর্মশালা চালান। বাসিন্দাদেরও সময় কাটে ভাল, এই আর কী।

বাগানটিলার চারপাশটা ফেন্স দিয়ে ঘেরা, আর ঘাসের ওপর দূরে দূরে একটা করে বেঞ্চ আর লাগোয়া টেবল পাতা আছে। একেবারে কিনার ঘেঁষে বেঞ্চখানাতেই বসলেন দু'জন। এখান থেকে সূর্যাস্ত ভারী মনোরম দেখায়। একবার অন্ধকার নেমে গেলে অবশ্য আর বাইরে থাকবার নিয়ম নেই, যেমন নিয়ম নেই সমুদ্রের ধারে যাবার। এই একটি কথা ভাবলেই নিজেকে বন্দি বলে মনে হয় উইলিয়মের। যদিও তিনি খেয়াল করেছেন, বাকি বাসিন্দাদের কেউ কখনও সমুদ্রে যাবার কথা তোলেননি। নাকি তুলেছেন, তিনি জানেন না, তাও হতে পারে।

"মার্থা, তোমার কখনও সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করে না?"

"করে, কিন্তু তুমি তো জানো, এখানে সে-নিয়ম নেই।"

"সেই ঘটনার পর থেকে কি?"

"হ্যাঁ, জানোই তো। তোমার আসার ঠিক আগের বছর। মিস্টার গ্রেস। একাই গিয়েছিলেন, ফিরলেন না। অ্যালঝাইমার্সের পাশাপাশি অবসাদ। সেই থেকে বন্ধ।"

"ঘটনাটা খুব দুঃখজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু একজনের জন্য বাকিরাও শাস্তি পাবে, এ কেমন কথা?"

"তুমি মাঝেমধ্যে ভারী বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন করো কিন্তু। অবশ্য আমার তা ভালই লাগে। নইলে তোমার বিদ্যেবুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠাই একরকম ঝকমারি। কিন্তু, আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"বলে ফেলো মার্থা।"

সূর্য, উত্তর সমুদ্র থেকে পাঠানো লালচে গোলাপি সূর্য এখন বেশ নেমে এসেছে জলের কাছে, চায়ে চুমুক দিতে চাওয়া ঠোঁটের মতোই। সেদিকে চেয়ে থাকা একই সঙ্গে আনন্দ আর অবসাদ এনে দিতে পারে মানুষকে, এ-কথাটা মনে হচ্ছিল উইলিয়মের। চুপচাপ সেইদিকে চেয়ে থাকতে পারলে হত ভাল, কিন্তু মার্থার সঙ্গে টুকিটাকি রোজকার গল্পটাও ভাললাগার অভ্যেসেই দাঁড়িয়েছে এখন, সেটা ছাড়তে চান না তিনি।

"তুমি ডক্টর বয়েলকে এত মিথ্যে বলো কেন উইলিয়ম? নাহ, ঠিক মিথ্যে নয়, মানে, আমি বলতে চাইছি ভুল। মানে, ঠিক ভুলও নয়, নিজের সম্বন্ধে একটা অন্য ধারণা দেওয়া। এটা কেন করো? এই বয়সে ওই বেচারি লোকটার সঙ্গে মশকরা করতে তোমার ভাল লাগে?"

"ভারী জটিল দেখছি প্রশ্ন তোমার। একটু খুলে বলবে কি?"

"আমার প্রশ্ন জটিল, না তোমার উত্তরগুলো? এই যে তুমি ডক্টর বয়েলকে বলেছ, বিস্মৃতির প্রতিশব্দ চাবি, বা ধরো, কী যেন বেশ, দোকানের প্রতিশব্দ ছদ্মবেশ, এইগুলো একরকম কাব্যিক ব্যাপারস্যাপার হতে পারে, কিন্তু সেই নিরীক্ষা ওই ডাক্তারের উপর চালানো কেন? সে তো ওর উপর ভিত্তি করে তোমার রিপোর্ট বানাচ্ছে? অথচ এমন নয় যে, তুমি সব ভুলে গিয়েছ, দিব্যি অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছ, আজও তোমার টেবল-এ নতুন লেখা দেখতে পেলাম। তা হলে? ছাড়া পেতে চাও না এখান থেকে?"

"অভিধান অনুযায়ী ভুল বলেছি হয়তো, কিন্তু অভিধানই যে ঠিক, তাই বা কে বলল তোমাকে?"

"অবশ্য তুমি তো আবার শুনলাম সমুদ্রের প্রতিশব্দ বলেছ অভিধান। চমৎকার!"

"ডাক্তার দেখছি ভারী মজার!"

"তা, সেই লোকটার সঙ্গে আরও মজা করার মানেটা কী শুনি উইলিয়ম?"

"অনুবাদ আসলে খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার, জানো তো মার্থা? এত বছর কাজ করতে-করতে আমি এইটুকু বুঝেছি। ভারী ব্যক্তিগত একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়। আমরা তাকে জোর করে, অনেক মানুষের বানিয়েছি। সমষ্টির বানিয়েছি। সর্বজনীন বানিয়েছি। কিন্তু ওতে কাজ হয় না শেষমেশ। সে ব্যক্তিগতই থাকে তোমার কাছে। এই যে আর কয়েক সেকেন্ড পর সূর্যটা ডুবে যাবে সমুদ্রে, যেভাবে সসপ্যানে ডিম ডুব দেয়, তোমার আর আমার কাছে তার অনুবাদও আলাদা। যিশুকে প্রথমে হত্যা করা হয়েছে, পরে উপাসনা করা হয়েছে। অনুবাদের হেরফেরে এরকমটা হয়।"

পাঁচ

কেন এই শহরটা টানতে শুরু করেছে তাকে অল্প সময়ের মধ্যেই, যেখানে সে ক'দিন আগেই থেকে এসেছে কার্ডিফের মতো জমজমাট আর রংচঙে একটা শহরে, আর তার চেয়েও বড় কথা, যখন সে এসেছে কলকাতা থেকে, সে-কথাই ভাবছিল সম্যক। এসে থেকে সে খুব একটা একলা হবার সুযোগ যে পেয়েছে এমন নয় এবং এখন, একটু একটু আন্দাজ করতে পেরে তার ভালই লাগছে যে, ক্যারোলের সঙ্গ বেশ উপভোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। এমনকী, ক্যারোল যখন রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে, ছাতার তোয়াক্কা না-করেই ঝিরঝির বৃষ্টি মাথায় এগিয়ে গেল পুরনো সেই ঘড়িটার দিকে, তখন তার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে এ-কথা ভেবে নেহাত কুণ্ঠাও হয়েছে সম্যকের যে, এই যে তাকে আর ক্যারোলকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একই সেশনে, তাও আবার হে ফেস্টিভ্যালের মতো সাহিত্য উৎসবে, যেখানে দুনিয়ার তাবড় সমালোচক, লেখক আর অনুবাদকদের হামেশা আনাগোনা, এটা ঠিক সুবিচার হয়নি। এবং শেষমেশ, স্বয়ং সিলভিয়ার প্রতিই এভাবে ঘটে যেতে পারে সেরা অবিচার, ক্যারোলের পিছন-পিছন হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল সম্যক, যখন দূরের ধোঁয়াঢাকা পাহাড় থেকে এই শহরেই রাত কাটানোর মতলবে নেমে আসছিল একদল মেঘ, যাদের পূর্বস্মৃতি নেই বললেই চলে।

কখন ওইসব ভারী মেঘ নেমে এসে হাজির হবে এই পাহাড়ি শহরের ছোটখাটো গলি রাস্তায়, তার অপেক্ষা না-করে বৃষ্টি বেশ সকাল থেকেই ঝরে চলেছে। আর সেই বৃষ্টি মাথায়, সোনালি আর লালচে বাদামি মেশানো চুলের ক্যারোল হাঁটতে হাঁটতে চলেছে, যেন তার হাঁটা ছাড়া কোনও কাজ জানাই নেই আর। সম্যক একটু পা চালিয়ে, প্রায় দৌড় দিয়েই, এক কালো ওভারকোট পরা ভদ্রলোককে প্রায় ধাক্কা মেরে, যিনি শার্লক হোমস সাজলে দারুণ মানাত বলে মনে হল, পৌঁছল ক্যারোলের পাশে। আর তাল মিলিয়ে হাঁটতে লাগল।

"তুমি আগেও এসেছ, এই শহরে?"

প্রশ্নটা নিজের গলায় নিজেরই বোকার মতো ঠেকল সম্যকের কাছে। কিন্তু ততক্ষণে সোনালি আর লালচে বাদামি মেশানো চুলের আস্তরণ ভেদ করে তা পৌঁছেছে ক্যারোলের কানে।

"হ্যাঁ, এসেছি তো। বেশ কয়েকবার এসেছি। ফেস্টিভ্যালে যদিও দু'বার এসেছি আগে, এই নিয়ে তিনবার হল। আমার রিসার্চ পেপারের একটা অংশ একবার প্রেজেন্ট করেছিলাম, খুব ভাল সাড়া মিলেছিল। সে যাই হোক, কিন্তু এসব ছাড়াও আমি মাঝেমধ্যে দু'-তিনদিনের ছুটি পেলে এখানে চলে আসি, জানো। শহরটা আমাকে টানে। এখন তো একে একরকম দেখছ তুমি, এত সাজগোজ, এত আয়োজন, এত যত্ন, সব কিছু। আর দেখছ এত এত মানুষের আনাগোনা। সারাক্ষণ তো এমনটা থাকে না, তখন আমার আরও ভাল লাগে শহরটাকে। বাড়ি থেকে অতিথিরা চলে যাবার পর একজন মহিলা যেভাবে নির্ভার হয়ে ওঠেন আয়নার সামনে, চুল খুলে দেন, সাজগোজ খুলে রাখেন, ক্লান্ত হয়ে বসে থাকেন চুপচাপ, সেইরকম। তখন এই শহরটাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। কখনও সেইরকম সময়েও এসো।"

"আসতে তো চাই এইরকম শহরে বারবার, কিন্তু আমাদের শহরটা এত দূরে যে, বারবার আসা ভারী কঠিন।"

"দেখেছ?" সম্যকের দিকে একঝলক তাকিয়ে সামান্য হেসে বলে উঠল ক্যারোল, "অধ্যাপক হবার এই এক বদভ্যাস। আলাপ হওয়া থেকে কেবল নিজের কথাই বলে চলেছি বকবকিয়ে। তোমার নাম ছাড়া অন্য কিচ্ছু কিন্তু জানা হয়নি আমার। বলবে না নিজের কথা?"

এইরকম প্রশ্নের সামনে সম্যক বরাবরই গুটিয়ে যেতে দেখেছে নিজেকে, কেননা তার বারেবারে মনে হতে থাকে যে, নিজের বিষয়ে বলবার মতো কিছুই এখনও তার হাতে নেই। খোদ ক্যারোলও যে আজ বিকেলে সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা করে ফেলবে, তা সম্যকের আন্দাজ ছিল না।

"আমাদের যার যার থাকার জায়গায় ফিরতে হবে তো, নাকি?"

"ওমনি কথা ঘোরানোর চেষ্টা? তার চেয়ে মুখের ওপর বলে দিলেই হয়, না হে ক্যারোল, আমি আমার বিষয়ে তোমাকে কিছুই বলতে চাই না। তোমার বুঝি সাতটার মধ্যে ঘরে ফেরার অভ্যেস? তাও ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে পাঁচটাই বাজে।"

"না না, এহে, তুমি নেহাতই ভুল বুঝছ আমাকে। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব?"

"বলে ফ্যালো।"

"তোমার প্রোফাইলের কারণেই আমি খানিক দূরে দূরে ছিলাম। এখন তোমার বাবার নাম জানবার পর তো কথা বলতেই ভয় করছে।"

"আই আন্ডারস্ট্যান্ড। যাঁরা ভাষা নিয়ে কাজকম্মো করেন, বাবার নামটা শুনলে তাঁদের একটু ঝামেলা হয় বই কী। কিন্তু হাউ আই উইশ, আমি তোমাকে একবার বাবার সঙ্গে আলাপ করাতে পারতাম। এক্কেবারেই রাশভারী লোক নন, জানো তো? অন্তত ছিলেন না।"

"ছিলেন না... মানে?"

"মানে, এখন তো অ্যালঝাইমার্সে ভুগছেন। অন্তত নিজে বলছেন তাই। ভুলে যাচ্ছেন ঠিকই অনেক কিছু, সেইসঙ্গে হাসিটাও। মজা করতে পারাও তো এক ধরনের অভ্যেস, না? সেই অভ্যেসের কথা ভুলে গেলে মজাকেও ভুলে যেতে হয়।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত ক্যারোল, এই তথ্যটা আমার জানা ছিল না।"

"জানার কথাও নয় কারও। আমিও বলি না কাউকে। কিন্তু সামহাউ, এই অল্প সময়ে, তোমাকে ঠিক বাইরের মানুষ বলে মনে হয়নি। তাই... বাবাও চান না কেউ জানুক। রাজ্যের লোক গিয়ে বিরক্ত করবে..."

"তোমার কাছেই থাকেন উনি?"

"বুড়ো বাধ্য হলে তো! খুব সুন্দর জায়গায় থাকেন অবশ্য। কেমব্রিজের চেয়ে ঢের সুন্দর একখানা জায়গা। নর্দার্ন ওয়েলস-এ, ক্রিকেথ নামের একখানা পাহাড়ঘেরা সৈকতে থাকেন এখন। এক হোমে। আমি দু'মাসে একবার যাই, এ-দেশে থাকলে। আড্ডা দিয়ে আসি ভরপুর। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয়, ওখানে গিয়ে বাবার সঙ্গেই থেকে যাই। বাট আই অ্যাম নট এলিজিবল।"

"এ কিন্তু তোমার বিনয় হচ্ছে ক্যারোল। নয় কি?"

"একেবারেই নয়। ও জায়গাটা আসলে একটা বিলাসবহুল চিকিৎসাকেন্দ্র। অ্যালঝাইমার্স রোগীদের জন্য। ওখানে থাকতে হলে দুটো কোয়ালিফিকেশন লাগে। বিস্মৃতি এবং টাকাপয়সা। যার কোনওটাই এখনও আমার নেই। হয়তো, আনফরচুনেটলি। প্রথমটা বাবারও তেমন নেই, আমি জানি। আছে অল্প, নিশ্চয়ই, কিন্তু আরও অনেক কিছু ভুলে যেতে চান তিনি। আশা করেন, একদিন সত্যিই বিস্মৃতি পুরোপুরি গ্রাস করবে তাঁকে। সেই আশা থেকেই ওখানে গিয়ে থাকা। ওখানকার লোকজনও তাতে ভারী খুশি। সত্যি কিছু মনে আছে কি না কারও, সে আর আমরা বাইরে থেকে কে-ই বা বুঝতে পারি, বলো?"

মেঘগুলো দূরের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে, একবার মাথা তুলে আলগা তাকিয়ে দেখতে পেল সম্যক, যখন সে একইসঙ্গে এও বুঝতে পারল যে, সেইসব অবরোহী মেঘের মধ্যে ওত-পেতে-থাকা নেকড়েদের মুখভঙ্গি লুকিয়ে আছে কোথাও, যা এই পাহাড়ি উপত্যকার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খেতে চাইছে না এখন, বিশেষত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন তারা দু'জন কথা বলতে বলতে আকাশ প্রায় নিভিয়েই এনেছে আর হাঁটতে হাঁটতে সেই জমজমাট চত্বর, ঘড়িঘর আর লোকজনের ঠান্ডা অথচ ব্যস্ত যাতায়াত ছাড়িয়ে চলে এসেছে ছোট্ট এই শহরটার আরও ছোট্ট বসতিপূর্ণ অলিগলিতে, যেখানে রাস্তা যে-কোনও নদীর চেয়েও এঁকেবেঁকে বইছে, যেন-বা গাঢ় তরল কোনও, আর তার পাশে পাশে ছোট্ট ছোট্ট সব কটেজের কেয়ারি থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে সাদা আর মেরুন ফুলের গুচ্ছ, এই সন্ধে-হয়ে-আসা টিপটিপে দিনটায় যাদের দিকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি করে চোখ পড়ছে।

"চলো, এবার ফেরা যাক।"

একটা জাফরি কাটা কাচ-কাঠের জানলার গা দিয়ে নিজেদের ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে বলল সম্যক। তার এবার ঠান্ডা লাগতে শুরু করেছে একটু একটু।

"বেশ, তাই হোক..."

সেনাপ্রধানের নির্দেশে সৈন্যদল যেভাবে লহমায় অ্যাবাউট টার্ন নেয়, ঠিক সেইভাবে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে ফের উলটো দিকে হাঁটতে হাঁটতে ক্যারোল এই জবাবটা দেওয়ায় সম্যক বেশ আওয়াজ করেই হেসে ফেলল।

"হেসে কাজ হবে না। তোমার কথা কিছু বলো। পরশু আমাদের সেশন। একটু নিজেদের জেনে নিলে ক্ষতি কী?"

"আমি সেই অর্থে ভারী সাধারণ পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত, কলকাতাতেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। মা ইকনমিক্সের অধ্যাপক, বাবা ইংলিশের। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ক্লাস সেভেনে সেই যে ইংরেজি কবিতার ভূত মাথায় চাপল, দেখতেই পাচ্ছ, আজ অবধি নামেনি। বাবা-মা অবশ্য খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন, যখন আমি ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করবার সিদ্ধান্ত নিই। ভাই বোন নেই, এক সন্তান। একটু আদরে মানুষ। যেমনটা তুমি জিজ্ঞেস করছিলে তখন।"

"আর প্রেম?"

একজন বেসামাল সাইকেলওলা, ওপাশের মোড় থেকে ঘোরার সময়, সম্ভবত নতুন নামা অন্ধকারে দু'জনকে ঠাহর করতে না-পেরে বেশ কাছ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। সামনের একটা বাড়ির কাঠের জানলা খুলে দিলেন কেউ একজন, ভিতর থেকে পিয়ানোর আওয়াজ ছাড়া পেয়ে নেমে এল রাস্তায়, ঠিক যেরকম কলকাতার পুরনো পাড়ায় হারমোনিয়াম-সন্ধেগুলো, ভাবছিল সম্যক। তার মধ্যে এই প্রশ্নটা সে আশা করেনি একেবারেই।

"প্রেম... সত্যি বলতে কী, ছিল, কিন্তু..."

"এখন আর নেই। তাই তো?"

"নাহ।"

"হুম। কবে ভাঙল?"

"সে হয়েছে, বছর তিনেক।"

এতক্ষণে তারা আবার লোকজনের মধ্যে ফিরে এসেছে দেখে খানিকটা আশ্বস্তই হল সম্যক।

"আমরা কি একটু জোরে পা চালাতে পারি, ক্যারোল?"

"তোমার দেখছি বড্ড তাড়া? নাকি প্রেমের কথা তুললাম বলে মনে করলে কিছু?"

"না না, একেবারেই তা নয়। সত্যি বলব? ঠান্ডা লাগছে।"

"লাগুক একটু ঠান্ডা। ওয়েলস-এ এসে যদি ঠান্ডা না-লাগে, বৃষ্টি না-লাগে, তা হলে আসা কেন? চলো, সামনের মোড় ঘুরে এখানকার সবচেয়ে বড় আর পুরনো বইয়ের দোকানটা পড়বে। সেখানে একবার ঢুঁ মেরে যাব। কেমন?"

"বেশ। তা, তোমার প্রেম?"

ওই গির্জার ঘড়ি ছ'বার বাজল পরপর। খুব প্রাচীন আর গম্ভীর গং না-হলেও, এই ছোট্ট অঞ্চলের বাকি সব জটলার গুঞ্জনকে ছাপিয়ে তা দিব্যি শোনা গেল। ক্যারোল, যদিও, মোটেই বিব্রত হল না এমন প্রশ্নে। অবশ্য তেমনটা আশাও করেনি সম্যক। বরং সে বুঝেছে, তার সামনে থাকলে বিব্রত হবার সম্ভাবনা নিজেরই বেশি এবং তা দিনের মধ্যে অনেকবার।

"আমার? প্রেম? হয়েছে বললে ইংলিশ টেন্স-এর অপব্যবহার হবে। হয়। আমার প্রেম হয়। হতে থাকে। নানা মানুষের সঙ্গে, বইয়ের সঙ্গে, শহরগুলোর সঙ্গে, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে, নতুন নতুন লোকজনের সঙ্গে, আবার নিজের সঙ্গেও। যখন যেরকম মেজাজ থাকে, হয়।"

"এটা কিন্তু ভারী এড়িয়ে যাওয়া উত্তর হল।"

"না না, সিরিয়াসলি বলছি, বিশ্বাস করো, ওরকম ধরে-বেঁধে একজনের সঙ্গে প্রেম আমার আসে না। আসেনি কোনওদিন। তুমি একটা বইয়ের একটাই কবিতা পড়ে বাকি বইটা আর একদিনও না-খুলে রেখে দিতে পারবে? সেটা হয়? ওইরকম। আমার সঙ্গে চলতে ফিরতে চারপাশের প্রেম হয়। তার মধ্যে পুরুষ থাকে, নারী থাকে, বই থাকে, গাছপালা থাকে, আবার শহরের রাস্তাঘাটও থাকে। কোথাও ধরা দিতেই হবে, কে বলেছে এমন? হুম?"

ঘড়িঘরের মোড় ঘুরে বাতাস কিছুটা কম ঠান্ডা বটে, আর এখানে মানুষজনের চলাচলও অনেক বেশি। রাস্তাঘাট। গাছপালা। মানুষজন। বইপত্র। নারীপুরুষ। কবিতাগদ্য। শীতবৃষ্টি। শব্দের সঙ্গে শব্দ কত সহজে জুড়ে যায়, যাতে সেলাইয়ের দাগটুকু না থাকে। আর সেভাবেই এক বইয়ের পাশে, এই বৃষ্টিভেজা ফুটপাথেও, আর-এক বইকে ঠেসে সাজাচ্ছেন এক বৃদ্ধ। একটা ঝলমলে রেস্তরাঁর ঠিক বাইরে। তাঁর ঠোঁটে আধনেভা একটা সিগার, পুরনো বইয়ের পাশে পুরনো বই জুড়ে জুড়ে দাঁড় করাচ্ছেন তিনি। আজ সন্ধেয় কি একটাও বিক্রি হবে, তাঁর এইসব বই?

কাচের পুরনো দরজা। ঘষা কাচ। বৃষ্টির জল লেগে আরও ঝাপসা।

ভিতরে পা দিলেই গন্ধ। বইয়ের। অনেক অনেক পুরনো বইয়ের বাঁধানো গন্ধ।

ছোট ছোট হলদেটে আলো। ফ্রন্ট ডেস্ক-এ বয়স্কা মহিলা। হাস্যমুখ।

নেমে যাওয়া সিঁড়ি তারপর।

তারপর উঠে যাওয়া সিঁড়ি।

মাটির ওপরে একতলা।

মাটির নীচে আর-একতলা।

র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাকের পর র‍্যাক।

বই।

বই।

পুরনো।

ধুলোপড়া।

ধুলোমোছা।

পাতা ভাঁজ খাওয়া। পাতা হলুদ হওয়া। পাতা খসতে থাকা। নতুন-পাতা-না-গজানো বই সব।

ছোট-ছোট হলদেটে আলো, র‍্যাকের মাথায়-মাথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিছনে যতদূর তাকাও, বই।

সামনে যতদূর তাকাও, বই।

দু'পাশে যতদূর তাকাও, বই।

হাত থেকে হাতে ফেরা। বাতিল। বিক্রি হয়ে যাওয়া। ফেলে দেওয়া। কুড়িয়ে পাওয়া।

বই।

বই।

পুরনো।

বাদামি মলাট। নীল মলাট। ছাই মলাট। মেরুন মলাট। ধূসর মলাট। মলাটহীন।

পিছনে যত দূর তাকাও, বই।

সামনে যত দূর তাকাও, বই।

দু'পাশে যত দূর তাকাও, বই।

বইয়ের বাইরে কোনও পৃথিবী নেই।

পৃথিবীর বাইরে কোনও বই নেই।

বই।

বই।

পুরনো বই।

এরকম একটা দোকানে যখন প্রায় হাত ধরেই তাকে নিয়ে এসে ঢুকল ক্যারোল, এটা জেনেই যে আর পাঁচ মিনিট পর তার ওই ঘষা কাচের দরজায় CLOSED লেখা গোমড়া বোর্ড সাঁটিয়ে দেওয়া হবে নির্মমভাবে, সম্যকের অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। পুরনো বই একসঙ্গে সে অনেক যে দেখেনি, তা নয়। কলেজ স্ট্রিটই তো আছে। কিন্তু এভাবে দেখেনি। মাটির তলার ফ্লোরে নেমে, দুটো দীর্ঘ, শেষ-না-হতে-চাওয়া র‍্যাকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার কেবল 'দ্য ম্যাট্রিক্স' সিনেমাটার কথা মনে পড়ছে। এইরকম দীর্ঘ, অন্তহীন করিডোরে কতবার যে সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে কিয়ানু রিভস-কে। দু'পাশে অন্তহীন দরজার সারি। যে-কোনও একটা খুলেই যে-কোনও পৃথিবীতে ঢুকে পড়তে পার তুমি। ঠিক এই বইগুলোর মতোই।

"আমার কী মনে হয় জানো, পৃথিবীতে প্রতিটি বইয়ের একটা করে জুড়ি আছে, কাউন্টারপার্ট যাকে বলে। আলাদা সময়ে লেখা, আলাদা দু'জন মানুষের লেখা দুটো বই, কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক। যেন জিগস পাজল-এর দুটো পিস, যারা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যাবার অপেক্ষা করছে। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না ব্যাপারটা, তাই না?"

সত্যি বলতে কী, ক্যারোলের বলা কথাগুলো সামান্য আবছাই লাগছিল সম্যকের, কেননা তার কথাকে ছাপিয়ে সম্যকের চোখ এসে লাগছিল ভারী কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারোলের উজ্জ্বল চেহারা, যে-ঔজ্জ্বল্য, সম্যক নিশ্চিত, কেবল রূপের নয়, মেধারও। পুরনো বইয়ের এই স্যাঁতসেঁতে দোকানে, অসংখ্য বই-বীথির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল, কেবল এই আশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে এই বইয়ের দোকানে তার দেখা করানোর জন্য পুরো ব্যাপারটা তৈরি করা হয়েছে। এটা কেবল এক দীর্ঘ নকশা, আজকের সন্ধে অবধি পৌঁছনোর খাতিরে। যদিও এইসব ভাবনার কিছুমাত্র প্রকাশ না-করে দিব্যি বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে সম্যক বুঝিয়ে দিল যে, হ্যাঁ, সে অবশ্যই বুঝতে পারছে ক্যারোলের কথা এবং ক্যারোলও তাতে দ্বিগুণ উৎসাহ পেয়ে আবার বলে উঠল, "যেরকম একজন মানুষের জন্য পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও ঠিক আর-একজন মানুষ থাকে, তাদের একজীবনে দেখা হোক আর না-হোক, থাকে ঠিকই। আর যদি কখনও তাদের দেখা হয়ে যায়, তা হলে তারা ঠিক বুঝতে পারে তরঙ্গের মধ্য দিয়ে, কোথাও কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটছে। কী, তাই না? আমার কেমন যেন বিশ্বাস সম্যক, বইয়ের ক্ষেত্রেও সেটা হয়। দুটো বই, পৃথিবীর দু'প্রান্তে অপেক্ষা করে থাকে, কবে তারা কোথাও একটা মলাটে-মলাটে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াবে। কবে তারা একই র‍্যাকে জায়গা পাবে পাশাপাশি, বা এক টেবল-এ শুয়ে থাকবে একে অন্যের উপর, যেভাবে ভালবাসার দু'জন মানুষ থাকে। আমার কী মনে হয় জানো, সত্যি এরকম দুটো বই পাশাপাশি রাখলে, কোথাও কিছু একটা ঘটে। নিশ্চিত ঘটে। একটা বদল, একটা রিঅ্যাকশন, প্লেট টেকটনিক-এর মতো একটা কিছু, বা একটা বিস্ফোরণ... কিছু একটা। আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু কিছু একটা হয় নিশ্চয়ই।"

এটুকু বলে, দম নিয়ে, আরও একবার মুখ খুলল ক্যারোল, "এতক্ষণে আমাকে তুমি সম্পূর্ণ উন্মাদ ভাবতে শুরু করেছ নিশ্চয়ই?"

ক্যারোলের সামনের পাটির ঝকঝকে দাঁতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে গ্রন্থের আলো, প্রাচীন, যেন বহুদিন বসে থাকবার পর অফিসে তালা দিয়ে বাড়ি ফিরছেন ফাঁকা স্টেশনের গার্ড কোনও। এমনটা মনে হল সম্যকের। সে ক্যারোলের হাসির দিকে তাকিয়েই বলল, "কক্ষনও না। বরং ভাবছি, সত্যি এমন দু'খানা বইয়ের মুখোমুখি দেখা হলে কী কী হতে পারে। আমার তো পুরনো বইয়ের গন্ধই দারুণ ভাল লাগে। তোমার লাগে না?"

"অবশ্যই। জানো, এখন মনে হয়, বই পড়েছি যত-না, শুঁকেছি তার চেয়েও বেশি। আর মনে হয়, পুরনো বইয়ের গন্ধের মতো একখানা পারফিউম যদি বাজারে আনতে পারত কেউ... ইস..."

একটুও না-হেসে, খুব আশ্চর্য আর গম্ভীর গলায়, তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথাটা বলল ক্যারোল, আর সামনের একটা বই বের করে এনে অনির্দিষ্ট একখানা পাতা খুলে তাতে ডুবিয়ে দিল নরম নাক। তার নিশ্বাস টানার শব্দ, এই থমথমে বন্ধ দোকানের মধ্যে শোনা গেল দিব্যি।

"তুমি বুঝি বই শুঁকবে বলে এখানে এলে?"

"বইয়ের গন্ধ নেওয়া আমার নেশা, জানো তো? মারিজুয়ানার মতো। পৃথিবীর কত-কত শহরে কত আজগুবি বইয়ের দোকানে যে একের পর এক বই খুলে গন্ধ নিয়ে গিয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। আমার তো মনে হয়, সব বই পড়বার জন্য ছাপাও হয় না। কেবল পুরনো হবার পর হলদে পাতা খুলে গন্ধ নেওয়া হবে, এই জন্যই ছাপা হয়। জানো, কত ট্র্যাশ লেখার উপর আমার মায়া, কেবল পুরনো গন্ধের জন্য?"

সম্যক কিছুতেই বলতে পারছে না যে, ক্যারোলের হাতভর্তি খুলে রাখা পুরনো বইয়ের গন্ধের পাশাপাশি এই মুহূর্তে সে ক্যারোলের প্রশ্বাসের মিঠে আর তপ্ত সুগন্ধও পাচ্ছে, যার নির্ঘাত ক্ষমতা আছে সম্মোহনের, নইলে এই ভর সন্ধেবেলায়, এই বইয়ের দোকানে সম্যকের পা টলে যেত না।

"এ কী, টলছ কেন তুমি? দেখলে, তখন খেতে বললাম, খেলে না। চলো এখন। থাকার জায়গায় ফিরে শিগগির খাবে। দেখতে হবে ফ্রিজে কী কী আছে।"

"না না, আমি ঠিক আছি। দেখতে হবে মানে? তুমি এখন আমার সঙ্গে আমার ঠিকানায় যাবে নাকি?"

"যেতে তো হবেই মিস্টার ঘোষাল, তোমার পাশের রুমটাই যে আমার নামে দেওয়া হয়েছে, সে-খেয়াল তুমি না-করলেও, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন বেসামাল সাইকেলওলা, ওপাশের মোড় থেকে ঘোরার সময়, সম্ভবত নতুন নামা অন্ধকারে দু'জনকে ঠাহর করতে না-পেরে বেশ কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

সকালেই লক্ষ করেছি। বাইরের খাবার খেয়ে কাজ নেই, আজ এই ব্রিটিশ প্রফেসরের হাতের ফ্রেঞ্চ ওমলেট আর সসেজ খেয়ে ঘুমিয়ে নাও, কাল লম্বা দিন। বুঝলে? চলো এবার, বেরনো যাক।"

দু'জনের তিন দিনের থাকার ঠিকানা এক হওয়ার ব্যাপারটা শেষমেশ ভাল হল, নাকি না-হলেই ভাল হত, সেটা ভাববার আগেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে ডান দিকের আকাশে চোখ আটকে গেল সম্যকের। মেঘ কেটে গিয়ে হলদে আর উজ্জ্বল একটা চাঁদ উঠেছে দিগন্তের একটু উপরে, আর তার ঠিক কয়েক হাত নীচেই, প্রায় একই রকম উজ্জ্বল আর হলুদ হয়ে জ্বলে আছে গির্জার ঘড়ি। দুটো কাঁটা ছাড়া, ঘড়ি আর চাঁদে কোনও তফাত দেখতে পেল না সম্যক।

ছয়

"তার চেয়ে বরং একখানা মজার গল্প আমি বলি তোমায়, কেমন?"

সূর্য ডুবেছে ঠিক একটু আগেই, এখন আইরিশ বে-র শান্ত জলের নীল অনেকটাই হয়ে এসেছে কালচে। আর তার উপরে হালকা গোলাপি ঠান্ডা আকাশ এখন। উইলিয়ম চা নেহাত মন্দ বানান না, দু'জনের সামনে রাখা অনেকক্ষণ আগেকার ফাঁকা কাপই তা বলে দিচ্ছে। এর মধ্যেই এখানকার চটপটে তরুণী পরিচারিকা এলেনা একদফা এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছে, কোনওরকম খাবার, পানীয়, বা নিদেনপক্ষে গরম পোশাক তাঁদের লাগবে কি না। এ আসলে একরকম ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেওয়াই যে, সন্ধে হল বাপু, এবার যার যার কটেজে ফেরো। আর ঘণ্টা দেড়েক পর ডিনারের বেল বাজবে, তখন জড়ো হয়ে যত খুশি গল্প কোরো গে।

"হঠাৎ গল্প শোনাবার ইচ্ছে হল যে তোমার? শরীর-টরির ঠিক আছে তো, নাকি?"

"গল্প কি আর আমি বলতে পারি? ঠিক গল্পও নয়, বুঝলে মার্থা? ঘটনা। আমার জীবনের, আমার দেখা, একখানা ঘটনা। তবে অনেক বছর আগেকার ঘটনাকে অনেকসময় দূর থেকে গল্প বলে ভুল হয় না? ওইরকম আর কী। তাই গল্প কথাটা বললাম।"

"তা বলো, শুনি তোমার ঘটনা।"

"তুমি অনুবাদের কথাটা বললে কি না, তাই মনে পড়ে গেল হঠাৎ। শুনতে একঘেয়ে লাগলে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ো কিন্তু, কেমন?"

"সে তোমায় আর বলে দিতে হবে না। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এখন বলো।"

"বছর তিরিশেক আগেকার কথা, বুঝলে? হার্ভার্ডে ফিরে গিয়েছি, অনুবাদ আর ভাষাতত্ত্বের উপরে কর্মশালায় ডাক পড়েছে। সেই প্রথম, মনে আছে আমার, মেয়েকে অক্সফোর্ডের বাড়িতে রেখে বাইরে যাওয়া। তার বয়স তখন মাত্র সাত, দু'বছর আগেই সে তার মা-কে হারিয়েছে। অথচ কীভাবে যেন, ওর ওই মুখের দিকে তাকিয়েই আরও-আরও কাজ করে চলবার জোর পেতাম আমি। প্রতিবেশীরা অবশ্য দেখাশোনা করতেন ভারী যত্ন নিয়ে, দেখভাল করার একজন মহিলাও ছিলেন, কিন্তু হার্ভার্ডে গিয়েও, গোড়ার দিকটা কাজে মন বসত না আমার কিছুতেই। মন অবশ্য বসল আস্তে-আস্তে, যখন মনের মতো বন্ধু পেয়ে গেলাম আরও চারজন। স্পেন থেকে গিয়ের্মো, লেবানন থেকে শকাফ, চিন থেকে জুং পেই, ইতালি থেকে তোরিস আর খোদ আমেরিকারই জ্যাক। সব মিলিয়ে জনা পঁচিশের দল ছিল আমাদের, কিন্তু তাদের মধ্যে তেমন-তেমন মিশুকে বলতে আমরা এই ছ'জনই ছিলাম। ওই ছ'মাসে হার্ভার্ডে আমরা খুব ভাললাগার কিছু কাজ করতে পেরেছিলাম। তার অনেকটাই আমার মনে আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে মনে আছে সেই রাতের ঘটনা, যার পর বেশ কয়েকদিন কেউই আমরা কোনও কাজ করতে পারিনি।"

"কোনও বড় দুর্ঘটনা বুঝি?"

এতটা শোনবার পর মার্থা কিছুতেই নিজের কৌতূহল আটকে রাখতে পারলেন না। আলো মরে এসেছে চারপাশে ঠিকই, কিন্তু খুব সামান্য হাসির রেখা ফুটলে তা বোঝা যাবে না, এতটাও কম হয়ে যায়নি। মার্থা দেখতে পেলেন সেই রেখা।

"একরকম দুর্ঘটনা বলতে পারো বই কী। মানুষের অহং ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়াকে কেবল ঘটনা আখ্যা দিলে তো ছোটই করা হয়, না?"

"অহং? কার অহং? তোমার ওই পাঁচ পণ্ডিত বন্ধুর অহং-এর কথা বলছ বুঝি?"

"ছ'নম্বর পণ্ডিতকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছ কীভাবে? নাহ, ওরা তেমনটা ছিল না, যদিও খুব গুণী ছিল প্রত্যেকেই, কিন্তু বিনয়ী ছিল ভারী। ভিতর থেকেই ছিল। অহংকারী ছিলাম আমি। উইলিয়ম ব্রাইট।"

"তুমি? অহংকারী? এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? তোমার মতো প্রাজ্ঞ অথচ মাটিছোঁয়া মানুষ আমি আর দুটো দেখিনি।"

"মাটিতে ফেলে দেয় যদি কেউ, অনেক উপর থেকে, সে তো বাকি জীবন মাটি ছুঁয়েই থাকবে, তাই না মার্থা?"

"এইবার কিন্তু বড্ড হেঁয়ালি হচ্ছে উইলিয়ম, তুমি তো জানোই, আমার ধৈর্য কম।"

"শোনো তা হলে, বলি। সে-সময়ে আমি বড্ড অহংকারী ছিলাম। একগাদা ডিগ্রি বাগিয়েছি, অক্সফোর্ডে তুমুল খাতির, কেমব্রিজ ডাকছে রোজ-রোজ, দুনিয়ার হেন কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে আমাকে যেতে হচ্ছে না। আমিও ভাবতে শুরু করেছি যে, চারপাশের আর-পাঁচজন পণ্ডিতের চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি। আর মুশকিল হচ্ছে, তারাও তা ভাবতে শুরু করেছে। ফলে হয়েছে কী, সে-সময়ে আমার চারপাশে একখানা গুরুত্বের বলয় তৈরি হয়েছে, আমিই তৈরি হতে দিয়েছি। এই যে পাঁচজনের কথা বললাম, এরাও কিন্তু কোনও তর্কে আমার উপরে কথা বলত না। পরে ভেবে দেখেছি, সেই মান্যতার ঘেরাটোপ এরা আমাকে দিয়েছিল বলেই তাদের অত সহজে আমি বন্ধু বলে মেনেছিলাম তখন।"

"আশ্চর্য! আজকের তোমার সঙ্গে কিন্তু কোনওভাবেই মেলানো যায় না।"

"মেলানো যে যায় না, তার জন্য সেই রাতটাও অনেকটাই দায়ী, যার গল্প আমি এখন তোমাকে বলব। সেটা ছিল জুলাইয়ের একটা রাত, সবে আমাদের একখানা সেশন খুব ভালভাবে উতরেছে। তা ঠিক করা হল, ব্যাপারটাকে সেলিব্রেট করব। সেলিব্রেট করা মানে, ওই আর কী, বাইরে কোথাও একটু ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা দেওয়া, আর পানভোজন করা। বস্টনের মাঝামাঝি হার্ভার্ড স্কোয়ারে তুমি কখনও গিয়েছ কি না জানি না, অত বড় একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশের চত্বর যে অমন জমজমাট অথচ ছিমছাম হতে পারে, সে হার্ভার্ড স্কোয়ারকে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সন্ধে থেকে সেখানে আমরা বসে কফি খেয়েছি, আড্ডা দিয়েছি, এক বুড়ো বেহালাবাদক প্রচুর পুরনো ব্যালাড বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন, ছ'জন মিলে তাঁকে এত ডলার বকশিশ দিয়েছি যে, তিনি পড়ি-কি-মরি করে বাক্সে বেহালা গুটিয়ে একরকম কেটেই পড়লেন। তারপর ঢুকে পড়েছি ওই চত্বরেরই একটা খুব ছোট বার ও রেস্তরাঁয়। ঝাল-ঝাল ভেড়ার মাংস আর টাটকা শ্রিম্প ছিল প্ল্যাটারে, মনে আছে আমার। সেইসঙ্গে সকলে নিচ্ছে টেকিলা শটস, আমি অবশ্য চিরকালই হুইস্কির অনুরাগী। এখন যদিও ওয়াইনে মন মজেছে, সে যাক গে। তা এইরকম চলতে চলতে, বেশ রাতের দিকে, সকলেরই যা হয়, ভালরকম নেশা হয়ে গিয়েছে। তখন রেস্তরাঁয় লোক একেবারে কমে এসেছে, কেবল একটি উনিশ কি কুড়ি বছরের মেয়ে বারটেন্ড করছে। ভারী মিষ্টি মুখখানা তার, ঘন সোনালি চুল উঁচু করে বাঁধা পিছনদিকে, একটা কালো ফ্রকের ওপর লাল সাদা অ্যাপ্রন পরেছিল সে, এও মনে আছে আমার। তা আমরা করেছি কী, বাইরে এসে ধূমপান করে নিচ্ছি এক দফা। তখন বস্টন শহরে বেশ ঠান্ডা হাওয়া বইছে, বিকেলের দিকটায় বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, চারপাশের অনেক রেস্তরাঁই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। কাজ একেবারেই কম বলে, আমাদের অর্ডারখানা হেঁশেলে বুঝিয়ে দিয়ে এসে, বারটেন্ডার সেই মেয়েও আমাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে একবার হেসেওছে। এরই মধ্যে গিয়ের্মো হঠাৎ বলল, একটা খেলা খেলতে হবে। কী খেলা? না, আমাদের যার যার নিজস্ব ভাষায় একটা করে কবিতা জোরে-জোরে পড়ে শোনাতে হবে, স্মৃতি থেকে। গিয়ের্মো-র ইয়া স্প্যানিশ চেহারা, তার প্রস্তাবে না-করা আত্মহত্যারই শামিল তখন, তা ছাড়া, খেলার পিছনে তার যুক্তিটাও খুব একটা খারাপ ছিল না। সে বলল, এই এতদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করতে করতেও তো আমরা কেবল ইংরেজিতেই কথা বললাম, কার ভাষা কেমন শোনায়, সেটা জানা হল না ভাল ভাবে। যদিও অনেকেই ইংরেজি, স্প্যানিশ বা ইতালিয়ান জানতাম, তাও, নিজের ভাষায় তো একদিনও কথা বলিনি, কেবল আমি আর জ্যাক ছাড়া। তাই আজ যার যার ভাষায় কবিতা বলবার দিন।"

"বাহ, এ তো দারুণ মজার প্রস্তাব!"

মার্থা যে দিব্যি ঢুকে গিয়েছেন হার্ভার্ড স্কোয়ারের সেই সন্ধেয়, তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন।

"হ্যাঁ, সত্যিই মজার প্রস্তাব। তাই আমরা কেউ দেরি না-করে যার যার ভাষায় কবিতা বলা শুরু করলাম। আমি ইয়েটস-এর একখানা কবিতার কিছু অংশ বলেছিলাম, মনে আছে। গিয়ের্মো নিজে ভারী চমৎকার বলল, লোরকার লেখা ছিল সেটা। আর এইসব যখন ঘটছে রাতের ঠান্ডা হার্ভার্ড স্কোয়ার চত্বরে, সেই মেয়ে, সেই বারটেন্ডার মেয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমাদের পাগলামো উপভোগ করছে। হঠাৎ, আমাদের সকলের বলা শেষ হতেই, গিয়ের্মো দৌড়ে গেল তার দিকে। গিয়ে তার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে তাকে একরকম হুকুমই করে বসল যে, এইবার তাকেও একখানা কবিতা বলতে হবে, তার মাতৃভাষায়। মেয়েটি সম্ভবত মার্কিন, কেননা সে সেইরকম ইংরেজিই বলছিল। কিন্তু গিয়ের্মোর ওই আচমকা আক্রমণাত্মক অনুরোধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। গিয়ের্মোর দেখাদেখি আমরাও ছুটে গিয়েছি তার কাছে, মেয়েটিকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছি সকলে। মেয়েটি যত বলছে, সে একটাও কবিতা জানে না, কবিতা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়, গিয়ের্মো তত খেপে গিয়ে বলছে যে, সে যখন এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন সেও ওই খেলার অংশ, তাকেও কবিতা বলতেই হবে, নইলে ছাড় নেই।"

"ভারী খ্যাপা লোক তো এই গিয়ের্মো?"

"ও ওইরকমই ছিল। মেয়েটি তখন কাঁচুমাচু মুখে আমাদের সকলের দিকে তাকাচ্ছে, যদি কেউ রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। আমি তাকে চোখের ইশারায় বললাম, কোনও সুযোগই নেই, বরং সে যদি ছাড়া পেতে চায়, তার উচিত এখনই একটা চার লাইনের হলেও কবিতা বলে ফেলা, চটপট।"

"বোঝো কাণ্ড! আহা রে বেচারি! তা কী করল সেই মেয়ে?"

"সেইটাই বলছি। সে যখন শেষমেশ বুঝল যে, নিস্তারের কোনও উপায়ই নেই, তখন দোকান ছেড়ে এক দু'পা এগিয়ে এসে চুপটি করে দাঁড়াল, চোখ বন্ধ করে। চারপাশে তখন পথিক বিশেষ কেউ নেই, দূরে এক-দু'জন সাইকেল আরোহী ছাড়া। চোখ বন্ধ দেখে আমরা বুঝলাম, নিশ্চয়ই ছেলেবেলার কোনও ছড়া মনে করছে কোনওক্রমে। তারপর, সে তার লাল-সাদা অ্যাপ্রনখানা খুলে নামিয়ে রাখল রাস্তায়, জুতোজোড়া ছেড়ে সরিয়ে রাখল এক পাশে। এক মুহূর্ত দাঁড়াল। আর তারপর, তাকে ঘিরে অর্ধেক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের ছ'জনের সামনে, একটা দেড় মিনিটের ব্যালে পিস নেচে দেখাল। কেউ কোথাও নেই, দু'-একটা দোকানের টিমটিমে আলো, ঠান্ডা হাওয়া, আমরা, আর আমাদের নেশা। তার মধ্যে একটি মেয়ে নিখুঁত নেচে চলেছে, শহরের রাস্তায়। দেড় মিনিটের মাথায় নাচ থামিয়ে সে বলল, 'এইটাই আমার জানা একমাত্র কবিতা,' বলে, আমাদের স্তম্ভিত অবস্থায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে, জলদি হাতে অ্যাপ্রন কুড়িয়ে নিয়ে, কোনও রকমে পায়ে জুতো গলিয়ে, ছুটে চলে গেল রেস্তরাঁর ভিতরে, আমাদের ডিনার সার্ভ করবে বলে। আমরা ছ'জন, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভিতরে ঢুকে খাবার খেলাম যে, সে-ও পাথরের মানুষ হয়ে। তারপর কেউ কারও সঙ্গে একটিও কথা না-বলে, চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেলাম যার যার বিছানায়। এমনকী মেয়েটির সঙ্গেও আর একটিও কথা বললাম না। বলার মুখই ছিল না আমাদের। আমার সমস্ত পড়াশোনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব জানা, যত রাজ্যের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান, কবিতা ও তার অনুবাদ বিষয়ক যাবতীয় ডিগ্রি ও লেখালিখি, সেইদিন একটা বাচ্চা মেয়ের নরম পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর কোনওদিন জোড়া লাগেনি।"

বলতে-বলতে খেয়াল করেননি উইলিয়ম, শুনতে-শুনতে মার্থাও টের পাননি, কখন সমুদ্রের কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠে এসেছে গোল একখানা চাঁদ। ঠান্ডা বাতাস বয়ে আনছে আইরিশ বে, মাঠের ঘাসগুলো সবুজের বদলে দেখাচ্ছে ধাতব রুপোলি, আর দূর থেকে বাজতে শোনা যাচ্ছে ডিনারের গং, যা ভেসে আসছে তাদের হলদেটে আলো-জ্বলা বিশাল ডাইনিং রুম থেকেই, যেখানে এখন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহারি সব রুটি, অ্যাসপারাগাসের স্যুপ আর টার্কির সেদ্ধ মাংস, অন্তত বাতাসে ভেসে বেড়ানো গন্ধ তাই বলছে, কিন্তু সেই গন্ধও, কিছুতেই এই দু'জন মানুষকে ভিতরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে তুলতে পারছে না।

উইলিয়ম তাকিয়ে আছেন সোজা, ঘন ওক গাছের জঙ্গল পেরিয়ে, চিকচিক করতে থাকা সমুদ্রের দিকে।

মার্থা তাকিয়ে আছেন সোজা, ঘন ওক গাছের জঙ্গল পেরিয়ে, চিকচিক করতে থাকা সমুদ্রের দিকে।

কেবল মার্থা তাঁর বাঁ হাতটা দিয়ে চেপে ধরলেন উইলিয়মের ডান হাতের পাতাখানা।

একটা ঢেউ, আগের কোটি বছরের অগণিত ঢেউয়ের মতোই, মিলিয়ে গেল সাদা বালির গায়ে।

উইলিয়ম পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, মার্থার অনামিকায় বসানো আস্ত হিরেটা।

রোদে সে কেমন বিচ্ছুরণ ঘটায়। কিন্তু এই চাঁদের আলোয় তার কোনও অহমিকা নেই।

সেই আংটি থেকে ঠিকরে নয়, গড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের তরল বায়বীয় আভা।

নীলচে, শান্ত, অভিযোগহীন আভা।

জ্যোৎস্নার অনুবাদ।

ভাবলেন উইলিয়ম।

হিরের ভাষায়।

সাত

সকালেই একবার দেশে ফিরে যাবার কথা মনে হচ্ছিল সম্যকের, যখন সে ঘুম থেকে উঠে চুপচাপ, একেবারেই বাক্যহীনভাবে বিছানার উপর বসেছিল আর জানলার বাইরে জমেছিল নিখাদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কুয়াশা, যা তার ছোটবেলা থেকে চেনা, বছরশেষে বেড়াতে যাবার সুবাদে। বাবার বাতিক ছিল বড়দিনের ছুটি পড়লেই তাদের নিয়ে শিলং বেড়াতে চলে যাওয়া আর সুবিধে ছিল মা ব্যাপারটা পছন্দই করতেন, তাই এ নিয়ে বছরের পর বছর কোনও রকম বিরোধিতা আসেনি। একবার, তেমনই বেশ শীতে, মনে আছে সম্যকের, তাদের গেস্ট হাউসের একেবারে জানলার কাছে নেমে এসেছিল মেঘের গুচ্ছ, যেভাবে হঠাৎ ট্রেন স্টেশনে দাঁড়ালে ভিখারিরা কাচের জানলায় নেমে আসেন কোত্থেকে কে জানে, সেইভাবেই। গেস্ট হাউসের কাচের জানলার বাইরে, দেখা যেত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে কেউ কেউ, দেখা যেত পাইপের ধোঁয়ায় মোড়া লোকজন, কখনও সে দেখতে পেত লাল চাদর জড়ানো চুপচাপ তার মাকেও, যিনি একা একা গেস্ট হাউসের বাগানে বসে থাকতে ভারী পছন্দ করতেন।

"মা, তুমি অনেক ভোরে উঠেছ? ডাকোনি কেন আমাকে?"

"না রে, এই তো একটু আগে উঠলাম। তুমি ব্রেকফাস্ট করবে এখন? আজ কিন্তু সোয়েটার পরে থাকবে সারা দিন, বৃষ্টি হতে পারে। কেমন?"

"বাবা কোথায় গেছে?"

"এই কাছেপিঠেই বেরিয়েছে কোথাও। তোমার বাবাকে তো জানো। এতক্ষণে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে হয়তো গল্পই জুড়ে দিয়েছে, তাই না?"

"বিচ্ছিরি লাগে আমার।"

"কী বিচ্ছিরি লাগে?"

"বাবার এইরকম গল্প করা। কলকাতাতেও বাবা এইরকম করে। ওইজন্যে আর বাবার সঙ্গে বাজারে যাই না। সক্কলের সঙ্গে গল্প করে বাবা।"

"কিন্তু তুমি তো জানো, ওইটাই তোমার বাবার স্বভাব, কথা বলা, মানুষের সঙ্গে কথা বলা। সে আজ নয়, যখন তুমি জন্মাওনি, তখনও। রাস্তায় ঘাটে বাজারে হাটে ট্রেনে বাসে দোকানে সিনেমা হলে, সে যেখানেই হোক না-কেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলা তার চাইই। একবার তো, মনে আছে, আমাদের বিয়েও হয়নি তখন, জানো, সিনেমা হলে গিয়েছি, লাইট হাউস। আমরাই শেষ টিকিট কাটছি, ভেতরে শো শুরু হয়েছে। বাবা কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকের সঙ্গে গপ্পো জুড়ল এই রকম। বিরাট এক গপ্পো, কীভাবে সিনেমা হলে রিল চালানো হয়, সেই নিয়ে তার তো দারুণ কৌতূহল, আর কাউন্টারের ভদ্রলোকও শোনার মানুষ পেয়ে যাবতীয় জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছেন। ভাবো একবার, আমি কিন্তু পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, ভেতরে সিনেমাটা চলছে। কিছুক্ষণ পর দেখি হলের দরজা ঠেলে অনেকে বেরিয়ে আসছেন। কী, না ইন্টারভাল হয়েছে। বোঝো একবার কাণ্ডখানা। আমার দিকে একবার কাঁচুমাচু মুখে তাকাল, তারপর বলল, অর্ধেক ফিল্ম কি তোমার ভাল লাগবে? চলো, বরং চা খেতে যাই। এই হচ্ছে তোমার বাবার কাণ্ড। এরকম অনেক-অনেক আছে, ক'টা আর বলব। দ্যাখো গিয়ে, আজও এই ঠান্ডার মধ্যে কাউকে একটা পাকড়াও করে গল্প জুড়েছে কোথাও।"

"তুমি সেদিন রেগে যাওনি?"

"প্রথম-প্রথম যেতাম, জানো তো, এই তুমি যেমন রেগে যাও বাবার হাত ধরে বাজার গেলে, তেমনই আমিও রেগে যেতাম। এ কী অলুক্ষুণে ব্যাপার! চেনা নেই, জানা নেই, ওমনি গল্প জুড়ে দিলেই হল? আর সে যেন বুঝতেও পারত, কার সঙ্গে গল্প জোড়া যাবে। সেইসব মানুষও কিন্তু দিব্যি তোমার বাবার সঙ্গে একদফা আড্ডা দিয়ে নিত। প্রথম প্রথম রাগ হত খুব। বলেওছি এক-দু'বার। খুব অল্প হেসে আমাকে কী বলত জানো? তপতী, চেনা মানুষ ক'টাই-বা হয় পৃথিবীতে। অচেনাদের সঙ্গে আড্ডা না-দিলে জানবে কী করে, পৃথিবীটা কেমন? এই কথার পর তাকে আর বকা যায়, বলো তুমি?"

"আমি আজ বাবাকে বকব না তা হলে?"

"একটু বকতে পার চাইলে, বেশি বোকো না।"

"তুমি অচেনা মানুষ চেনো, মা?"

"বাবাই, চেনা মানুষ চেনার চেয়ে অচেনা মানুষ চেনা অনেক সহজ। এ-কথা তুমি বড় হলে বুঝবে। কিন্তু সকলের অচেনা মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকে না। তোমার বাবার আছে। পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের মন পড়ে ফেলবার ক্ষমতা। সে তো পড়ায় কলেজে, দাড়িওলা একটা লোকের নাটক পড়াতে হয় তাকে, জানো তো?"

"কে মা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?"

"উঁহু, বিদেশের এক লেখক। তাঁর নাম উইলিয়ম শেক্সপিয়র। মস্ত বড় লেখক, জানো তো বাবাই, মস্ত বড়। তুমি হয়তো বড় হয়ে পড়বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর লেখা নাটক। তাঁর লেখা পড়াতে-পড়াতে, পড়তে-পড়তে বাবা বলে, অনেক-অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ না-হলে শেক্সপিয়রের নাটক বোঝা যায় না। চেনা লোক নয় কিন্তু, পথচলতি লোক। তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোনও-না-কোনও নাটকের চরিত্র। তোমার বাবা আসলে তার পড়া নাটকগুলোর চরিত্রদের খুঁজে বেড়ায়। এক-একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে আমাকে বলত, তপতী, আজ অমুককে দেখতে পেলাম, তপতী, আজ হুবহু এই চরিত্রটা খুঁজে পেলাম... এইসব পাগলামো করত তো চিরকাল। এখনও করে। আমি শিওর, এখন শিলং-এর কোনও একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে তোমার বাবা শেক্সপিয়রের নাটক থেকেই কাউকে ঠিক খুঁজে বার করেছে। আর এমনি-এমনি দাঁড়িয়ে গল্পই করে যাচ্ছে, সময়ের হুঁশ তার নেই। ফেরার পর জিজ্ঞেস করলে বলবে, তপতী, শেক্সপিয়র চারপাশের মানুষজন থেকে চরিত্র তুলে নিতেন, আমি যদি তা না-করি, তাঁর নাটক বুঝব কীভাবে? আজও তাই বলবে, আমি জানি।"

"তুমিও এই লোকটার, এই মস্ত বড় লোকটার লেখা পড়াও মা?"

"নাহ বাবাই, আমার বিষয় আর-একজন মস্ত বড় লোক। তিনিও বিদেশি, তাঁরও দাড়ি ছিল। তাঁর কথা বলি ছাত্রদের। তোমাকেও বলব, তুমি বড় হলে। এখন যাও, ব্রাশ করে এসো, আমি ফলের রস আনিয়ে রাখছি..."

সম্যক সোয়েটারটাকে উপভোগ করতে করতে বাথরুমে ঢুকে ব্রাশে পেস্ট লাগায়, তারপর মুখ তুলে চৌকো সাদা ফ্রেমের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, সে বড় হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। সেদিনকার শিলং-এর তিন ফুট দুই থেকে আজকের পাঁচ ফুট দশ। স্কেল দিয়ে মাপলে, পাক্কা আঠারো বছর।

দু'দিকে লাগোয়া চারখানা ঘর আর মাঝখানে প্রশস্ত ডাইনিং ও কিচেন, এই হল সম্যকদের ডর্মিটরির একতলার গঠন, যার একদিকের ঘরে আছে ক্যারোল, তার পাশে এক আলজিরিয়ান সাহিত্যিক, এবং উলটো দিকের ঘরে জায়গা পেয়েছে সম্যক। এক কাপ চায়ের হদিশ করতে রান্নাঘরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল, সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে, দশটার মধ্যে একবার ফেস্টিভাল চত্বরে পৌঁছনোর কথা, সাড়ে দশটায় তাদের সঙ্গে স্থানীয় একজন কবি আলোচনায় বসবেন, আগামিকালের সেশনটা তাঁরই চালিয়ে নিয়ে যাবার কথা।

রান্নাঘরে টেবিলের ওপর এক কাপ কালো কফি ধোঁয়া তুলে জানান দিচ্ছে যে, তাকে খুব বেশিক্ষণ আগে তৈরি করা হয়নি মোটেই। ডর্ম-এর দরজাটা আপাতত আধখোলা, সিঁড়ির কাছটায় গেলে আলোর আগেই কমে আসা তাপমাত্রা তা জানান দিচ্ছে।

"এই যে, ঘুম ভাঙল? আলাপ করিয়ে দিই, ইনি এমিলি। এমিলি টেলর। কবি, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী।"

চওড়া কাঁধ আর ছোট চুলের একজন হাসিখুশি মাঝবয়সি মহিলার সঙ্গে বাড়ির দরজার ঠিক সামনেটায় দাঁড়িয়েই খোশগল্প করছিল ক্যারোল, যখন দরজা খুলে আলতো মুখ বাড়াল সম্যক, আর তাকে দেখেই সোজা রাস্তায় ডেকে এনে আলাপপর্ব। সম্যক একটু অপ্রস্তুত হয়েই হাসল কেননা সে তখনও রাতপোশাক থেকে ছাড়া পায়নি এবং সেই অবস্থায় দুই মহিলার সামনে এভাবে হুট করে চলে আসাটা তার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিরই, যদিও সে এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, তার পোশাক নিয়ে ক্যারোল তো নয়ই, এই মহিলাও ভাবিত নন।

ক্যারোলের বিশেষণরাশি শেষ হতে-না-হতেই সকালের অভিবাদন সম্যককে জানিয়ে এমিলি বললেন, "ওরকম কিছুই নয়, বুঝলেন কিনা, এ দেশে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে করার ভণিতা না-করলে কেউ পাত্তা দেয় না বিশেষ, তাই এইসব ছলচাতুরি। সাংবাদিকদের তো কী ছিরি জানেনই, রাজনৈতিক কর্মীদের দৌড়ও নিশ্চয়ই আপনার জানা। আর জন্মসূত্রে এমিলি নাম পেয়েছি অথচ দু'কলম কবিতা চেষ্টা করব না, সে তো অন্যায়, না?"

নিজের রসিকতায় নিজেই যখন হেসে উঠছেন মাঝবয়সি এমিলি, অস্বস্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেল সম্যকের। এখানে মানুষজন বেশ অন্যরকম। ব্রিটিশদের মতো নয় যেন ঠিক। ওয়েলশরা স্বভাবতই অনেকখানি মিশুকে আর খোলামেলা এবং ব্রিটিশদের প্রতি মনে-মনে চটে থাকা, এটা সম্যক দিনকতকেই ভালরকম টের পেয়েছে।

"ইলেকশনের কাজ কেমন এগোচ্ছে?"

ক্যারোলের মুখে প্রশ্নটা শোনার সময়ে খেয়াল হল সম্যকের, এখানে আসার আগে থাকতেই শুনছিল নির্বাচনের কথা, যুক্তরাজ্য সাধারণ নির্বাচন। দেরি আছে কিছুদিন অবশ্য, কিন্তু প্রস্তুতি তুঙ্গে। কনজ়ারভেটিভ না লিবারাল, কার হাতে থাকবে ক্ষমতা, তার একখানা যাচাই। ভারী মজা লেগেছিল তার কার্ডিফ শহরের বাড়িগুলো দেখতে। দরজায় কাঠি দিয়ে লাগানো প্ল্যাকার্ড স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, কোন দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানাচ্ছেন বাড়ির মালিক। দেখে সম্যক ভেবেছে, তার নিজের দেশের মানুষ যার-যার বাড়ির বাইরে নিজেদের সমর্থন জাহির করতে শুরু করলে কী কাণ্ডটাই না হবে!

"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত আমাদেরই জিত হবে এবার। অবশ্য সারা পৃথিবীর ক্ষমতায়ন যেভাবে একবগ্গা হয়ে উঠছে, তাতে জোর গলায় এই আশার কথা বলতে তো পারি না সকলকে, কিন্তু তোমাকে বলছি ক্যারোল, এবারের নির্বাচনে লেবার পার্টি না-এলে আমাদের সক্কলের কপালে ভালরকম দুঃখ আছে।"

বাদামি আর ছোট চুল ঠিক করতে-করতে কথাটা বেশ আক্ষেপের সঙ্গেই বললেন এমিলি। তারপর বললেন, "দেখেছ, আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমি কিন্তু আগামিকাল তোমাদের সেশনের কোঅর্ডিনেটর। কী হবে না হবে তোমরা একটু ভেবে রেখেছ তো? কিছুক্ষণের মধ্যে ফেস্টিভাল চত্বরে এসো একবার, অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে, ভাল লাগবে। আজ একটা লম্বা চওড়া ডিনার আছে কিন্তু, ফেস্টিভালের কর্তারা দিচ্ছেন, মেনু নেহাত মন্দ নয়, লোকজনকেও তোমাদের খারাপ লাগবে না। সেখানেও অবশ্যই এসো। আর হ্যাঁ, কাল ফেস্টিভালের শেষ দিন, রাতে জোর খানাপিনা হবেই, জেনে রেখো। ফরমাল কিচ্ছু না, পরশু তো অনেকেই ফিরে যাবে যার যার জায়গায়, একসঙ্গে একটু আনন্দ করে সময় কাটানো, এই আর কী," আর-এক দফা হেসে নিলেন এমিলি, হাসি যে তাঁর মোটের উপর সুন্দর, সেটা ভালরকম জানার কারণেই বোধ হয়।

ডিনার নিয়ে এখন ঠিক ভাবতেই পারছে না সম্যক, কেননা তার কেবলই মনে হচ্ছে এত দামি একটা ফেস্টিভালে এত মানুষের সামনে বসে সিলভিয়া এবং জীবনানন্দের অনুবাদ নিয়ে কথা বলতে গেলে যে-প্রস্তুতি প্রয়োজন, তার ছিটেফোঁটাও তার নেই। এইসব ভেবেই সে কোনও উত্তর না-দিয়ে খানিক অভদ্রের মতোই গোমড়ামুখে একবার ক্যারোল আর একবার এমিলির দিকে তাকাল। তার হাতের কফিকাপ থেকে তখনও সুগন্ধী কড়া ধোঁয়া উঠে বাইরের কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আজ মনে হয় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই।

ক্যারোল, সম্ভবত সম্যকের দ্বিধাটুকু আন্দাজ করতে পেরেই তার স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হাসি বিলিয়ে দিয়ে বলল, "অনুষ্ঠান নিয়ে তুমি ভেবো না। অনুবাদগুলো তো রেডি আছে, ব্যস, একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই হবে।"

ক্যারোলের কথায় সায় দিয়ে এমিলিও বললেন, "বটেই তো, শোনো, এ কোনও তত্ত্ব আলোচনার জায়গা তো নয়, মানুষজন কবিতা শুনতেই বেশি পছন্দ করবেন। আমি হয়তো মাঝেমধ্যে দু'-একটা দায়সারা প্রশ্ন করব, অনুবাদ সংক্রান্ত। ওসব নিয়ে কিছু ভেবোই না। আসল হল হে ফেস্টিভালের আবহাওয়াটা উপভোগ করা, কি না? তোমরা ফ্রেশ হয়ে চলে এসো, বাকি আড্ডা অথর্স লাউঞ্জেই সারা যাবে। আমি এখন দৌড়ই, কালকের অনেক কাজ বাকি।"

এমিলি হাসিমুখ আর ভারী শরীর নিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তার বাঁকটা পেরিয়ে যেতেই কাছে এসে সদ্য-ঘুম-ভাঙা সম্যকের এলোমেলো চুলে নরম হাতের টাটকা বিলি কেটে দিয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল ক্যারোল।

"খাবে কিছু? ব্রেকফাস্ট? না ফেস্টিভালে গিয়ে, হ্যাঁ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিচেন থেকে ভেসে এল ক্যারোলের গলার স্বর।

"দাঁড়াও। বাবাকে একটা ফোন করে নিই। চিন্তা করবেন।"

"আমি অন্য ঘরে যাব?"

"আরে না না, এখানেই থাকো, কোনও অসুবিধে নেই।"

"বেশ তো, হ্যাঁ, তোমার দেশে তো এখন দুপুর, না? আর মা? মাকে করবে না ফোন?"

"মা তো এখন কলেজে, ক্লাস আছে হয়তো, মাকে বিকেলের দিকে পাব। বাবা রিটায়ার্ড মানুষ, ফোনের কাছেই বসে থাকেন সারা দিন।"

শুকনো হেসে পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে বাবার নম্বর ডায়াল করল সম্যক, যখন ফ্রিজের গায়ে হেলান দিয়ে বাইরের কুয়াশাঘেরা ছোট্ট পাড়াটার একফালি দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারোল।

সম্যক ফোন কানে ধরল।

তারপর চুপ করে থাকল।

তারপর চুপ করে থাকল।

তারপর চুপ করে থাকল।

তারপর চুপ করে থাকল।

তারপর চুপ করে থাকল।

তারপর চুপ করে থাকল।

তারপর ফোন কেটে দিল।

"কথা বললে না যে? লাইন পেলে না বুঝি?"

ক্যারোল কিছুটা ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করল যেন।

"না না, পেলাম। বাবা তুলেছিলেন ফোন।"

"তা হলে? বললে না কিছু বাবাকে?"

"উঁহু।"

"সে তো অবশ্য দেখলামই। তোমার বাবাও বললেন না কিছু?"

"বাবা কিছু বলেন না, গত দু'বছর। সেরিব্রাল অ্যাটাকে স্পিচ চলে গিয়েছে। শুধু তাকিয়ে থাকেন। আমিও ফোন করলে চুপ করেই থাকি। চুপ করে থাকলে, বাবা বুঝতে পারেন সব।"

আট

আজ সকালে কয়েকটা জরুরি চিঠি লেখবার ছিল উইলিয়ম ব্রাইটের। এই সমস্ত কেজো ব্যাপারের মধ্যে যদিও তিনি এখন আর থাকতে চান না, বিশেষত সেইসব দিনে, যখন নাকি কাচের জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের উপরে আস্তে-আস্তে ঘনিয়ে উঠছে মেঘ এবং তিনি স্পষ্ট এও বুঝতে পারছেন, বৃষ্টি নেমে আসতে পারে দুপুরের মধ্যেই। জুন মাস মানে থেকে-থেকেই বৃষ্টি হবে এখন। এখানে আসার পর থেকে বৃষ্টিটা, ওয়েলস-এর ভদ্রসভ্য বৃষ্টিটা আরও বেশি উপভোগ করেন উইলিয়ম। একদিকের দেওয়ালে টানা কাচের প্যানেল দিয়ে তাকিয়ে থাকতে এমনিই ভাল লাগে তাঁর। আর তা ছাড়া ভেবে দেখতে গেলে, লেখালিখি বাদ দিলে এই তাকিয়ে থাকা ছাড়া এখন করবারই-বা আছে কী, এমনটাই ভাবেন তিনি। অবশ্য হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে ডক্টর বয়েলের সঙ্গে গম্ভীর মশকরা বা মার্থার সঙ্গে নানা বিষয়ে ঝটপট আড্ডাও তিনি মন্দ উপভোগ করেন না। তবে সবচেয়ে তাঁর ভাল লাগে কাচের প্যানেল দিয়ে দূর থেকে আরও দূরে তাকিয়ে থাকতে, যেখানে দূরত্বের ধারণা কেবল জল। গাঢ়, নীল, শীতল, বিস্তৃত জলরাশি, আইরিশ বে, যা তিনি এখনও সামনে থেকে দেখেননি ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারছেন, শিগগির অফিসারকে বলে-কয়ে তা দেখার ব্যবস্থা তাঁকে পেতেই হবে।

এইটা ভেবেই, এই এত কেজো একটা সকাল শেষ করেও, ভাল লাগছিল উইলিয়ম ব্রাইটের, যখন তাঁর ঘরের আধখোলা দরজায় টোকা দিয়ে মুখ বাড়ালেন ব্যারেট। চার্লস ব্যারেট। এখানকার ইন্সপেকশন অফিসার।

"ভিতরে আসতে পারি কি একবার?"

"অবশ্যই, অবশ্যই, স্বাগত মিস্টার ব্যারেট। আসুন আপনি।"

হাসিটা যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে টাঙিয়ে কথাটা বললেন উইলিয়ম, যিনি লেখার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন প্রিয় কাচের প্যানেলখানার দিকে। এবার, ফিরে তাকালেন।

"একটু চা চলতে পারে তো আপনার? সদ্য চাপালাম কিন্তু।"

কথাটা উইলিয়ম না-বললেও পারতেন, কেননা ঘরে ম ম করছে অতি উচ্চমানের দার্জিলিং পাতার সুবাস। অবশ্য সে-কথা তাঁর নিজের বিশেষ বোঝবার অবকাশ নেই, কেননা এরকমটা সারা দিনে বহুবার ঘটে, কিন্তু অফিসার ব্যারেট ঘরে ঢোকামাত্র সুগন্ধটা এড়াতে পারলেন না।

"অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে চা অফার করার জন্য, প্রফেসর ব্রাইট। কিন্তু আজ আবার একটু শহরে ফিরতে হবে তাড়াতাড়িই, দুপুরে একটা জরুরি বৈঠক আছে কিনা। তাই, চা এখন থাক। আপনি বলুন, আছেন কেমন?"

চায়ের ভাগ এই লোকটিকে দিতে হবে না জেনে মনে-মনে যে একেবারে অখুশি হলেন উইলিয়ম, এ-কথা বলা চলবে না, কেননা লোক যতই পদস্থ হোক, কাছের মানুষ ছাড়া শখের এই চায়ের ভাগ দিতে মন থেকে তাঁর একধরনের আপত্তিই হয় বই কী আর সেদিক থেকে, ইদানীং বুঝতে পারেন তিনি, মার্থাকে বন্ধু হিসেবে বেশ কাছেরই মনে করছেন।

"কেমন আছি? তা দেখে আমাকে কেমন মনে হচ্ছে অফিসার?"

"দেখে ভাল-মন্দ বিচারের জায়গা যে এটা নয়, সে তো আপনার চেয়ে কেউ ভাল জানেন না প্রফেসর। ইন ফ্যাক্ট, আমি তো লোকজনকে বলি, আমাদের হোমে স্বয়ং প্রফেসর উইলিয়ম ব্রাইট আছেন। আর সত্যি বলতে কী, তাতে আমাদের কদর বাড়ে।"

অফিসার সিলিংছোঁয়া বইয়ের র‍্যাকটার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন কথাগুলো। র‍্যাকের যে-জায়গাটা এখন তিনি চওড়া পিঠ ঠেকিয়ে আড়াল করে আছেন, সেখানে, জানেন উইলিয়ম, পরপর রাখা আছে দু'খানা বই। একটা সিনট্যাক্স-এর জরুরি ইতিহাস এবং আর-একটা, তার ঠিক পাশেরটাই, প্রবাদ ও সত্যের আপাতবিরোধ সংক্রান্ত প্রামাণ্য এক গ্রন্থ। দুটোই ইদানীং ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে উইলিয়মের— নেহাত বই, তাই পারেন না। এক সময়ে ভারী আদর করে কিনেছিলেন। এখন ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। যত দূরে ছোড়া যায়, তত দূরে। আপাতত অফিসার তাঁর চওড়া পিঠ ও লম্বা দেহ নিয়ে সে-দু'খানা বই আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন বলে একটু আরাম পেলেন উইলিয়ম।

অফিসারকে বেশ সুঠাম দেখতে, এ-কথা তাঁর নিন্দুকেও স্বীকার করবে, এবং বলা বাহুল্য, এ অঞ্চলে তাঁর মতো উচ্চপদস্থ মানুষের নিন্দুক নেহাত সংখ্যায় কম নয়। সাদায় কালোয় মেশানো একটা প্রায়-আবছা যত্নে-কাটা গোঁফ তাঁর ফরসা, দৃঢ় মুখমণ্ডলকে আরও সম্ভ্রম আদায়কারী করে তুলেছে, যার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাঁর চওড়া কাঁধ, রিমলেস চশমার নীচে তীক্ষ্ণ ও সজাগ একজোড়া চোখ এবং ব্যাকব্রাশ করে রাখা চকচকে গাঢ় বাদামি ছোট চুল। অফিসারকে বড় একটা কেউ ঘাঁটায় না, এ-কথা উইলিয়ম জানেন। এবং এও জানেন, অফিসার, খোদ ইনস্পেকশন অফিসারও, তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস পান না।

"কদর বাড়ে কিনা জানি না অফিসার, আজকাল ক'জনের কাছে বইপত্তর বা পড়াশোনার কদর আছে, তাই তো বুঝি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কমেছে, নিঃসন্দেহে কমেছে প্রফেসর। আমরা ছোটবেলাতেও একটা বই পেলে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম, আজকালকার বাচ্চাদের মধ্যে সেই অনুভূতি বিরল। তবু, সাহিত্যের প্রতি আপনার অবদান তো অস্বীকার করা যায় না।"

মেঘটা এগিয়ে আসছে। শামুকের মতো নয়, সাবধানী খরগোশের মতোই। ঘন, কালো আর ভারী একখানা চওড়া মেঘ।। বেশ চওড়া। যার মধ্যে উইলিয়মের পুরো ঘরটাই ঢুকে যাবার কথা, তাঁর রাইটিং ডেস্ক সুদ্ধ। সেই মেঘ, সেই ঘন, ভারী আর চওড়া মেঘ এগিয়ে আসছে গুটিগুটি, চারপাশ আস্তে আস্তে স্লেট রঙের করে দিতে দিতে। দৃশ্যটা ছোট আকারে, যাকে বলে মিনিয়েচার ফর্মে দেখতে পাচ্ছেন উইলিয়ম, অফিসারের রিমলেস চশমার যমজ ফ্রেমের মধ্যে। তাঁর ইচ্ছে করছে এখনই বেরিয়ে গিয়ে নুড়ির হাঁটাপথ পেরিয়ে বাগানে গিয়ে খোলা হাওয়ার মধ্যে দাঁড়ান একবার, কিন্তু অভব্যতা তাঁর ধাতে নেই। শুধু অবাক হয়ে তিনি দেখছেন, যে-মেঘপুঞ্জের মধ্যে তাঁর ঘরসমেত গোটা হোমের এলাকাটাই হয়তো ঢুকে যেতে পারে, সেটা কী চমৎকার এঁটে গিয়েছে অফিসারের একজোড়া কাচের ফ্রেমের মধ্যে। আশ্চর্যই বটে।

"সমুদ্রের ধারে যাবার অনুমতি কবে পাব?"

অফিসার এই আকস্মিক প্রশ্নের উত্তরে একটা ঠোঁটচাপা হাসি হাসলেন প্রথমে, যা আসলে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে নেবার বাহানা, তারপর বললেন, "ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি বলেছি। আসলে আপনি তো জানেন, কয়েক বছর আগে কী ধরনের একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছে এখানে। আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল সেটাকে ব্যাখ্যা করতে।"

"জানি অফিসার, দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু তার শাস্তি তো বাকিরা পেতে পারেন না, তাই না?"

"একশোভাগ সহমত আমি আপনার সঙ্গে। আমাকে জাস্ট একটু সময় দিন।"

"চা চলবে না তা হলে?"

"নাহ, ওই যে বললাম, শহরে বৈঠক।"

অফিসার দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, উইলিয়ম সৌজন্যবশতই তাঁকে এগিয়ে দিতে দরজা পর্যন্ত এলেন, তারপর ব্যারেট হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা, ডক্টর বয়েলের রিপোর্টে দেখলাম কিছু অ্যানোম্যালি... যদিও আপনাকে দেখে ঠিক তেমনটা... আপনিই বলুন তো, ডক্টর ঠিকমতো চেক আপে আসছেন তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে নিয়ে আপনি ভাববেন না অফিসার। ডক্টর বয়েল সুদক্ষ একজন কর্মী, আমি মাঝেমধ্যে একটু মজা করে ফেলি আর কী। বুড়ো হয়েছি তো, বদভ্যাসগুলো আরও পেয়ে বসে। আপনি ভাববেন না।"

"বেশ, চলি তা হলে। যে-কোনও দরকারে একটা ফোনই যথেষ্ট। আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। দিন ভাল কাটুক আপনার।"

অফিসার আগের হাসিটার চেয়ে আর-একটু খরুচে হাসি হেসে করমর্দন করে হাঁটা দিলেন গাছপাহারার ফটকের উদ্দেশে। তাঁর চকচকে আর কালচে নীল বুটের আওয়াজ নুড়িতে একধরনের কুড়মুড় তুলল, যা উইলিয়মের মন্দ লাগে না।

চায়ের গন্ধটা এখন তাঁর পিছনদিকে। সামনে আসন্ন বৃষ্টির জন্য উন্মুখ সমুদ্র আর সেখান থেকে ধেয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের নোনা আর জোলো গন্ধ। তিনি সামনের দিকে যাবেন বলেই স্থির করলেন। টিপটিপ বৃষ্টি যে শুরু হবে আর মিনিট দশেকের মধ্যেই, তাতে সন্দেহ নেই কোনও। উপত্যকা পার করা পাহাড়ি অঞ্চলের টিলাজোড়া এই বিলাসী বসতিতে হুটহাট এসে পড়া বৃষ্টিই কেবল বাঁচাতে পারে বিষণ্ণতা থেকে, এ-কথা বিশ্বাস করেন উইলিয়ম, কেননা সাহিত্য, পৃথিবীর নানা ভাষার নানা মহৎ সাহিত্য ইদানীং তাঁকে আরও বিষাদের দিকে ঠেলে দেয়, কেন কে জানে। লিখিত অক্ষর, মুদ্রিত বাক্য দেখলেই ইদানীং একধরনের অবসাদ হয় তাঁর।

এই সব এলোমেলো ভাবনা ভাবতে ভাবতে, যখন উইলিয়ম খুব ধীরগতিতে হাওয়ার বিরুদ্ধে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছেন সমুদ্রের দিকে মুখ করা চারপাশ খোলা ঘন সবুজ বাগানের দিকে আর তাঁর ফিনফিনে ধবধবে লিনেন শার্ট রীতিমতো বিপ্লবের বিজয়ী পতাকার মতো উড়ছে বুকের দু' দিক থেকে, তখনই তিনি খেয়াল করলেন ডক্টর বয়েলকে। বাগানে ঢুকে পড়বার আর্চ আকৃতি ছোট্ট লোহার গেটটাকে ডাইনে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই একটা লম্বা টানা ঘর আছে, টিলার একেবারে ধার ঘেঁষে। এই হোমের ভাঁড়ার ঘর সেটা, বন্ধই পড়ে থাকে। চাবি থাকে নানান কাজের লোকের কাছে, যার যখন যেটা দরকার, নিজের মতো খুলে নিয়ে নেয়। তার পাথরের চওড়া দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর বয়েল। হাত-পা নেড়ে কী একটা বলছেন, কিন্তু তাঁর কথা, বিরক্ত রেডিয়োর আওয়াজের মতোই কেটে-কেটে যাচ্ছে সমুদ্রের নোনা বাতাসে। তাঁর মুখ কাঁচুমাচু এবং ব্যর্থ বলেই মনে হল উইলিয়মের। কার সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে এইভাবে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন ডক্টর বয়েল? কোনও বিপদ হল না তো?

উইলিয়মের সামনে বাঁ দিকখানা একটা আপেলগাছে ঢাকা বলেই ডক্টর বয়েলের উলটো দিকের মানুষটিকে দেখা যাচ্ছিল না, একটু এগোতেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন উইলিয়ম, সেটি ডক্টর বয়েলের স্ত্রী, রোলি। ফরসা ও রোগা রোলি আজ পরেছে শিশুগোলাপি রঙের একটি ফ্রক, ফ্লোরাল প্রিন্টের, সঙ্গে সেই একই রঙের একখানা ভ্যানিটি ব্যাগ সে ঝুলিয়েছে ডান হাতে, রোগা আর মোলায়েম দু'খানা পায়ে গলিয়ে নিয়েছে সদ্য কেনা বাহারি ও অভিজাত হিলস এবং নিজের মেহগনি রঙের ভারী চুলকে আইসক্রিমের সান্দ্র স্তূপের মতো চূড়া করে বেঁধে রেখেছে মাথায়, যেন মেঘ কেটে রোদ উঠলেই তা গলে যাবে তাড়াতাড়ি। রোলির মুখে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ছাপ আগেও লক্ষ করেছেন উইলিয়ম, যদিও তাঁর সঙ্গে মেয়েটির আলাপ কখনও হয়নি। আজ সেইসবের সঙ্গে বিতৃষ্ণার ছাপও চোখে পড়ল।

"তুমি প্লিজ, আমার কথা শোনো অন্তত একবার, প্লিজ রোলি, আমি হাতজোড় করছি।"

"ওসব নাটক তুমি আমার সামনে কোরো না একেবারেই, বুঝেছ? এই পাহাড়ের মাথায় সমুদ্রের সামনে লোকে তিন রাতের হানিমুনে আসতে পারে, কিন্তু তিন বছর? এটা কি থাকার জায়গা? সংসার করার জায়গা? তাও তোমার মতো মানুষের সঙ্গে যার কিনা আমার প্রতি কোনও হুঁশই নেই?"

"প্লিজ় রোলি, আস্তে বলো। এখানে চারপাশে আমার পেশেন্টরা আছেন, এমনকী অফিসার ব্যারেটও বোধ হয় এখনও এলাকা ছেড়ে যাননি।"

"বলব তো, এরপর আমি ওঁকেই বলব। তুমি কীভাবে আমাকে আটকে রেখেছ। এই দ্যাখো, এই যে, লন্ডন টাইমস একজন রিপোর্টার চাইছে। আর যা যা কোয়ালিফিকেশনস, তার সবক'টাই আমার আছে। তুমি এভাবে আমাকে দিনের পর দিন আটকে রাখতে পার না। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স!"

"রোলি, আমার ভালবাসাকে তুমি ক্রিমিলান অফেন্স বলছ? এটা তুমি বলতে পারলে?"

"পারলাম। ভালবাসার কথা কেবল ঝগড়ার সময় মনে করালে সেটাকে ভালবাসা বলা যায় না। এই তিন বছরে ক'বার ভালবাসার কথা বলেছ তুমি, হ্যাঁ? ক'বার বুঝিয়েছ যে তুমি ভালবাস আমায়? ক'বার কাছে এসেছ? এক বিছানায় শুয়ে থাকার মানেই ভালবাসা নয়, সেটা তুমি জানো না? আমাকে আটকানোর কোনও অধিকারই তোমার নেই। সেটা তুমি হারিয়েছ।"

"এসব কী বলছ রোলি, আমি অফিসারকে বলেছি একটা বদলির কথা..."

"টু হেল উইথ ইয়োর ট্রান্সফার অ্যান্ড ইয়োর জব। আমি অ্যাপ্লাই করেছি, সামনের মাসের তিন তারিখ ইন্টারভিউতে ডেকেছে। যদি পেয়ে যাই, আমি লন্ডন শিফট করব। তুমি থেকো এই পাহাড়চূড়ায়, সমুদ্র নিয়ে। থেকো তুমি..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রোলি, শোনো, রোলি..."

রোলি নতুন জুতোয় পুরনো নুড়ি মাড়িয়ে দ্রুতগতিতে চলে যেতে থাকে গাছপাহারার গেটের দিকে, তার পরের রাস্তার দিকে, রাস্তা ছাড়িয়ে হাইরোডের দিকে, হাইরোড ছাড়িয়ে বসতির দিকে, বসতি ছাড়িয়ে পরপর দাঁড়িয়ে থাকা গ্রসারি ও গ্যাস স্টেশনের দিকে, সেসব ছাড়িয়ে ছোটমোটো বিস্ত্রো ও ক্যাফেদের দিকে... তার ছোট্ট গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনে হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়িয়ে পড়েন ডক্টর বয়েল, যখন সেই গুঁড়ি-মারা মেঘ এগোতে-এগোতে এই গোটা এলাকার উপর নিজের সমস্ত জল ঢেলে দিয়ে, তাঁকে সুদ্ধ আপাদমস্তক ভিজিয়ে চলে যায়...

এসব কথার, রোলি ও ডক্টর বয়েলের সংলাপের কিছুই কানে যায়নি প্রফেসর উইলিয়মের, কেননা বেগতিক বুঝে তিনি বাগানের দিকে না-গিয়ে, পাশের নিচু রাস্তা ও সিঁড়ি ধরে চলে এসেছিলেন ডাইনিং হল লাগোয়া হেঁশেলে, যার একফালি চৌকো জানলা দিয়ে সমুদ্রের না-কাটা এলোমেলো চুলটুকু দেখা যায় কেবল। তিনি সেখান থেকেই, বৃষ্টি দেখছিলেন এতক্ষণ। বৃষ্টির চওড়া আর পাতলা চাদরটা দূর থেকে এসে সবটা ভিজিয়ে দিয়ে অন্যদিকের দূরে মিলিয়ে যেতে দশ মিনিট লাগল। সেই দশ মিনিটে মাংস ম্যারিনেট করে হেঁশেলে ঢুকে এলেন শেফ ভেন্তোরা। স্পেনের বাসিন্দা, দীর্ঘদিন ব্রিটেনে আছেন। এই হোমকে সুস্বাদু করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন শেষ দু'বছর।

"আজ স্পেশ্যাল ডিশ মনে হচ্ছে ভেন্তোরা, হ্যাঁ?"

ভেন্তোরা স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা ছড়িয়ে দিলেন আবছা-হয়ে-আসা হেঁশেলের মধ্যেই। তাঁর হাতের বড় পোর্সেলিনের গোলাটে পাত্রে রেড ওয়াইন আর সামান্য কিছু হার্বস দিয়ে ম্যারিনেট করা টুকরো টুকরো নরম মাংস, এবার আভেনে চাপল বলে।

"কী খাওয়াচ্ছ আজ?"

কৌতূহল চাপতে পারলেন না উইলিয়ম।

"খেয়ে দেখবেন মিস্টার ব্রাইট, ভাল লাগবে আপনার। খরগোশের মাংস।"

আভেন বন্ধ করার ধাতব শব্দ হল।

আকাশ খোলার শব্দ। ধাতব।

পরিষ্কার।

মেঘমুক্ত।

ধাতব।

আকাশ।

নয়

"আর এখানে কী কী দেখার ইচ্ছে তোমার বলো, শুনি?"

তাকে প্রশ্নটা করলেন এমিলি। সম্যক জানে, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত উদ্বেগ থেকে তার মন সরানোর জন্যই এমিলির এই চেষ্টা, যা বেশ আন্তরিক। সকালে ডর্মিটরি থেকে বেরিয়ে, হালকা ঠান্ডা আর কুয়াশার শিরশিরে চওড়া রাস্তা দিয়ে গমগমে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে আসতে-আসতে সে আর একবারও ক্যারোলের কানে দুশ্চিন্তার কথাটা তোলেনি। বরং দিব্যি নির্লজ্জের মতোই বলে ফেলেছিল, "তুমি একখানা ওয়েলশ কেক খাওয়াবে আমাকে? আমি পয়সা নিয়ে বেরোতে ভুলে গিয়েছি। এত নাম শুনেছি এই খাবারটার..."

তাদের ডর্ম থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে পড়তেই রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গিয়ে পৌঁছচ্ছে ফেস্টিভাল চত্বরে। বড় রাস্তার দু'পাশে পুরনো-পুরনো কটেজ, তাদের গা বেয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহারি সব গুল্ম, মনে হচ্ছে বাড়িগুলো দাড়ি কাটেনি অনেকদিন। এরপর রাস্তাটা যেখানে বেঁকছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মস্ত চওড়া সবুজ প্রান্তর, সার্কাসের মতো তাঁবু ফেলে হে ফেস্টিভাল চলছে। আর রাস্তার ডান ধারে, মানে ফেস্টিভাল চত্বরের ঠিক উলটোদিকে, একের পর এক অস্থায়ী দোকান সাজিয়ে বসে গিয়েছেন বয়স্কদের দল। কেউ বিক্রি করছেন হাতে বানানো লেখার খাতা আর কাঁধের ব্যাগ, তো কেউ বিক্রি করছেন সসেজ রোল আর কফি। তেমনই, এক বুড়িকে নজর করেছিল সম্যক, যিনি এক্কেবারে হাতে-গরম ওয়েলশ কেক আর প্যাটি বিক্রি করছেন এবং তাঁর দোকানে দিনভর খদ্দেরও খুব কম হচ্ছে না। এসব দিকের মিঠে আর সুস্বাদু এই ছোট্ট খাবারের কথা সে দেশে থাকতেই শুনেছিল, তাই ক্যারোলের কাছে, বিশেষত সকালবেলা তার মাথায় এলোমেলো বিলি কেটে দেওয়ার পর সেই ক্যারোলের কাছে এটুকু চাইতে দ্বিধা করল না সম্যক। আর ক্যারোলও, দিব্যি খুশি হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে দু'খানা তপ্ত, নরম, আলতো ধোঁয়া ওঠা ওয়েলশ কেক খরিদ করে আনল তার জন্য।

"জানো, বাবার খুব পছন্দ ছিল ওয়েলশ কেক। অথচ এখন এক্কেবারে খেতে চান না।"

বুড়ি তার হাওয়ায় পতপত করতে থাকা চাঁদোয়া টাঙানো দোকানের পাশেই কিছু নড়বড়ে চেয়ার টেবল রেখেছে, যদি কেউ বসে খেতে চায়। তারই একটায় পিঠ ঠেসিয়ে কথাটা বলল ক্যারোল। সে এখন পরেছে কালো রঙের একখানা গাউন আর তার ওপর খুব হালকা উলের বাদামি এক কার্ডিগান, যার বুনোটের নকশা দেখার জন্য কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করছে সম্যকের। আর বারেবারে, আগের দিন সন্ধেবেলার সেই বইয়ের দোকানের মতোই, কারণে অকারণে পেতে ইচ্ছে করছে ক্যারোলের প্রশ্বাসের সুগন্ধ, এই ওয়েলশ কেকের চেয়ে যা কোনও অংশে কম মিঠে বা কম তপ্ত নয়। এইভাবে সম্মোহন তৈরি হয়। এইভাবেই। সে, সম্যক, সে-কথা জানে, কিন্তু এই এখন, এই মুহূর্তে, বুঝতে চাইছে না কোনওমতেই।

"একটা কথা বলব ক্যারোল?"

ঠোঁটের ঠিক নীচে অল্প একটু ওয়েলশ কেক লেগে ছিল, জিভ দিয়ে সেটা কুড়িয়ে মুখের ভেতর আনার পর ক্যারোল বলল, "অনুষ্ঠান নিয়ে কিন্তু আর একটা কথাও নয়, কেমন?"

"না না, একেবারেই নয়। আমি কেবল ভাবছিলাম, মানে, জানি তা সম্ভব নয়, তবু যদি..."

"শোনো, এই ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলাটা আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না। কী ভাবছ খোলসা করে বলে ফেলো।"

"ভাবছিলাম, একবার কি প্রফেসর ব্রাইটের সঙ্গে দেখা করা যায়?"

ক্যারোলের খাওয়া শেষ, সে দূরের ধূসর বাদামি পাহাড়টার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন তার ঢাল বেয়ে পোস্টম্যান নেমে আসবেন একটু পরেই।

"আনফরচুনেটলি, নাহ। বাবা আর কোনও ভিজিটর চান না। আমার ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজনও দেখা করতে চেয়েছেন বহুবার, বাবার একটাই উত্তর। তোমাকেই-বা বলি কী করে। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, আগেকার মতো খোশমেজাজি বাবা হলে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশি হতেন।"

"বেশ বেশ, তা হলে অবশ্যই বলব না। কিন্তু তোমার কাছে আর-একটা প্রশ্ন ছিল। ঠিক প্রশ্ন নয়, কৌতূহল। সেটা অবশ্য মৃত্যু নিয়ে..."

"মৃত্যু নিয়ে?"

"হ্যাঁ, মৃত্যু নিয়ে।"

"তুমি কি পরলোকে বিশ্বাস-টিশ্বাস করো নাকি সম্যক? তা হলে কিন্তু আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব টেকা মুশকিল।"

"না না, সেসব আমার নেই। ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস উঠে যেতে শুরু করেছে, তার উপর আবার পরলোক?"

এই উত্তরে দু'জনেই একচোট হেসে উঠল। বুড়ি কেক বিক্রেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রোলি, শোনো, রোলি..."

রোলি নতুন জুতোয় পুরনো নুড়ি মাড়িয়ে দ্রুতগতিতে চলে যেতে থাকে গাছপাহারার গেটের দিকে, তার পরের রাস্তার দিকে, রাস্তা ছাড়িয়ে হাইরোডের দিকে, হাইরোড ছাড়িয়ে বসতির দিকে, বসতি ছাড়িয়ে পরপর দাঁড়িয়ে থাকা গ্রসারি ও গ্যাস স্টেশনের দিকে, সেসব ছাড়িয়ে ছোটমোটো বিস্ত্রো ও ক্যাফেদের দিকে... তার ছোট্ট গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনে হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়িয়ে পড়েন ডক্টর বয়েল, যখন সেই গুঁড়ি-মারা মেঘ এগোতে-এগোতে এই গোটা এলাকার উপর নিজের সমস্ত জল ঢেলে দিয়ে, তাঁকে সুদ্ধ আপাদমস্তক ভিজিয়ে চলে যায়...

এসব কথার, রোলি ও ডক্টর বয়েলের সংলাপের কিছুই কানে যায়নি প্রফেসর উইলিয়মের, কেননা বেগতিক বুঝে তিনি বাগানের দিকে না-গিয়ে, পাশের নিচু রাস্তা ও সিঁড়ি ধরে চলে এসেছিলেন ডাইনিং হল লাগোয়া হেঁশেলে, যার একফালি চৌকো জানলা দিয়ে সমুদ্রের না-কাটা এলোমেলো চুলটুকু দেখা যায় কেবল। তিনি সেখান থেকেই, বৃষ্টি দেখছিলেন এতক্ষণ। বৃষ্টির চওড়া আর পাতলা চাদরটা দূর থেকে এসে সবটা ভিজিয়ে দিয়ে অন্যদিকের দূরে মিলিয়ে যেতে দশ মিনিট লাগল। সেই দশ মিনিটে মাংস ম্যারিনেট করে হেঁশেলে ঢুকে এলেন শেফ ভেস্তোরা। স্পেনের বাসিন্দা, দীর্ঘদিন ব্রিটেনে আছেন। এই হোমকে সুস্বাদু করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন শেষ দু'বছর।

"আজ স্পেশ্যাল ডিশ মনে হচ্ছে ভেস্তোরা, হ্যাঁ?"

ভেস্তোরা স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা ছড়িয়ে দিলেন আবছা-হয়ে-আসা হেঁশেলের মধ্যেই। তাঁর হাতের বড় পোর্সেলিনের গোলাটে পাত্রে রেড ওয়াইন আর সামান্য কিছু হার্বস দিয়ে ম্যারিনেট করা টুকরো টুকরো নরম মাংস, এবার আভেনে চাপল বলে।

"কী খাওয়াচ্ছ আজ?"

কৌতূহল চাপতে পারলেন না উইলিয়ম।

"খেয়ে দেখবেন মিস্টার ব্রাইট, ভাল লাগবে আপনার। খরগোশের মাংস।"

আভেন বন্ধ করার ধাতব শব্দ হল।

আকাশ খোলার শব্দ। ধাতব।

পরিষ্কার।

মেঘমুক্ত।

ধাতব।

আকাশ।

নয়

"আর এখানে কী কী দেখার ইচ্ছে তোমার বলো, শুনি?"

তাকে প্রশ্নটা করলেন এমিলি। সম্যক জানে, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত উদ্বেগ থেকে তার মন সরানোর জন্যই এমিলির এই চেষ্টা, যা বেশ আন্তরিক। সকালে ডর্মিটরি থেকে বেরিয়ে, হালকা ঠান্ডা আর কুয়াশার শিরশিরে চওড়া রাস্তা দিয়ে গমগমে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে আসতে-আসতে সে আর একবারও ক্যারোলের কানে দুশ্চিন্তার কথাটা তোলেনি। বরং দিব্যি নির্লজ্জের মতোই বলে ফেলেছিল, "তুমি একখানা ওয়েলশ কেক খাওয়াবে আমাকে? আমি পয়সা নিয়ে বেরোতে ভুলে গিয়েছি। এত নাম শুনেছি এই খাবারটার..."

তাদের ডর্ম থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে পড়তেই রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গিয়ে পৌঁছচ্ছে ফেস্টিভাল চত্বরে। বড় রাস্তার দু'পাশে পুরনো-পুরনো কটেজ, তাদের গা বেয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহারি সব গুল্ম, মনে হচ্ছে বাড়িগুলো দাড়ি কাটেনি অনেকদিন। এরপর রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মস্ত চওড়া সবুজ প্রান্তর, সার্কাসের মতো তাঁবু ফেলে হে ফেস্টিভাল চলছে। আর রাস্তার ডান ধারে, মানে ফেস্টিভাল চত্বরের ঠিক উলটোদিকে, একের পর এক অস্থায়ী দোকান সাজিয়ে বসে গিয়েছেন বয়স্কদের দল। কেউ বিক্রি করছেন হাতে বানানো লেখার খাতা আর কাঁধের ব্যাগ, তো কেউ বিক্রি করছেন সসেজ রোল আর কফি। তেমনই, এক বুড়িকে নজর করেছিল সম্যক, যিনি এক্কেবারে হাতে-গরম ওয়েলশ কেক আর প্যাটি বিক্রি করছেন এবং তাঁর দোকানে দিনভর খদ্দেরও খুব কম হচ্ছে না। এসব দিকের মিঠে আর সুস্বাদু এই ছোট্ট খাবারের কথা সে দেশে থাকতেই শুনেছিল, তাই ক্যারোলের কাছে, বিশেষত সকালবেলা তার মাথায় এলোমেলো বিলি কেটে দেওয়ার পর সেই ক্যারোলের কাছে এটুকু চাইতে দ্বিধা করল না সম্যক। আর ক্যারোলও, দিব্যি খুশি হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে দু'খানা তপ্ত, নরম, আলতো ধোঁয়া ওঠা ওয়েলশ কেক খরিদ করে আনল তার জন্য।

"জানো, বাবার খুব পছন্দ ছিল ওয়েলশ কেক। অথচ এখন এক্কেবারে খেতে চান না।"

বুড়ি তার হাওয়ায় পতপত করতে থাকা চাঁদোয়া টাঙানো দোকানের পাশেই কিছু নড়বড়ে চেয়ার টেবল রেখেছে, যদি কেউ বসে খেতে চায়। তারই একটায় পিঠ ঠেসিয়ে কথাটা বলল ক্যারোল। সে এখন পরেছে কালো রঙের একখানা গাউন আর তার ওপর খুব হালকা উলের বাদামি এক কার্ডিগান, যার বুনোটের নকশা দেখার জন্য কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করছে সম্যকের। আর বারেবারে, আগের দিন সন্ধেবেলার সেই বইয়ের দোকানের মতোই, কারণে অকারণে পেতে ইচ্ছে করছে ক্যারোলের প্রশ্বাসের সুগন্ধ, এই ওয়েলশ কেকের চেয়ে যা কোনও অংশে কম মিঠে বা কম তপ্ত নয়। এইভাবে সম্মোহন তৈরি হয়। এইভাবেই। সে, সম্যক, সে-কথা জানে, কিন্তু এই এখন, এই মুহূর্তে, বুঝতে চাইছে না কোনওমতেই।

"একটা কথা বলব ক্যারোল?"

ঠোঁটের ঠিক নীচে অল্প একটু ওয়েলশ কেক লেগে ছিল, জিভ দিয়ে সেটা কুড়িয়ে মুখের ভেতর আনার পর ক্যারোল বলল, "অনুষ্ঠান নিয়ে কিন্তু আর একটা কথাও নয়, কেমন?"

"না না, একেবারেই নয়। আমি কেবল ভাবছিলাম, মানে, জানি তা সম্ভব নয়, তবু যদি..."

"শোনো, এই ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলাটা আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না। কী ভাবছ খোলসা করে বলে ফেলো।"

"ভাবছিলাম, একবার কি প্রফেসর ব্রাইটের সঙ্গে দেখা করা যায়?"

ক্যারোলের খাওয়া শেষ, সে দূরের ধূসর বাদামি পাহাড়টার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন তার ঢাল বেয়ে পোস্টম্যান নেমে আসবেন একটু পরেই।

"আনফরচুনেটেলি, নাহ। বাবা আর কোনও ভিজ়িটর চান না। আমার ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজনও দেখা করতে চেয়েছেন বহুবার, বাবার একটাই উত্তর। তোমাকেই-বা বলি কী করে। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, আগেকার মতো খোশমেজাজি বাবা হলে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশি হতেন।"

"বেশ বেশ, তা হলে অবশ্যই বলব না। কিন্তু তোমার কাছে আর-একটা প্রশ্ন ছিল। ঠিক প্রশ্ন নয়, কৌতূহল। সেটা অবশ্য মৃত্যু নিয়ে..."

"মৃত্যু নিয়ে?"

"হ্যাঁ, মৃত্যু নিয়ে।"

"তুমি কি পরলোকে বিশ্বাস-টিশ্বাস করো নাকি সম্যক? তা হলে কিন্তু আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব টেকা মুশকিল।"

"না না, সেসব আমার নেই। ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস উঠে যেতে শুরু করেছে, তার উপর আবার পরলোক?"

এই উত্তরে দু'জনেই একচোট হেসে উঠল। বুড়ি কেক বিক্রেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার হেসে তাদের দিকে তাকালেন। হয়তো তাঁর আশা, এদের আড্ডা জমে গেলে এরা আরও দু'-চারখানা কেক বা প্যাটি কিনে নিয়ে বসবে।

"সেইরকম মৃত্যুর কথা বলছি না। আমি বলছি..."

"শোনো..."

সম্যকের বাক্য মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল ক্যারোল, "যেরকম মৃত্যুই হোক, এই চমৎকার ওয়েলস-সকালে প্রাতরাশ সারতে-সারতে সে-কথা উত্থাপন না-করাই তো ভাল। দিনের শেষে বরং শোনা যাবে। তুমি মনে করে রেখো কথাটা। আসলে কী জানো, রাত না-নামলে আমি মৃত্যু নিয়ে কোনও কথা বলতে পারি না। শুনতেও পারি না। চলো, ওঠা যাক। এমিলি অথর্স লাউঞ্জে অপেক্ষা করে থাকবে। একদফা ব্রেকফাস্ট তো ওখানে গিয়েও সারতে হবে, না কি?"

ক্যারোলের মৃত্যু-বিষয়ক বাক্যটার মানে করবার খুব বেশি চেষ্টা করে যে লাভ নেই বিশেষ, সম্যক সেটা বুঝেই একটা শুকনো হাসি ফিরিয়ে দিল তাকে। এরপর তাদের হাঁটা ফেস্টিভাল চত্বরের দিকে। হাঁটা আর কতটুকু, একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তা পার করে নিলেই হল। সম্যক, ওই হাঁটতে হাঁটতেই ভাবছিল, মানুষ কত নরমভাবে অপারক হতে পারে কত সময়ে। সে এখন যেখানে আছে, তার থেকে তিন ঘণ্টার ড্রাইভে আছেন খোদ উইলিয়ম ব্রাইট, এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে একই ডর্ম শেয়ার করছে সম্যক, যে-কন্যা, বুঝতে পারছে সে, তাকে খুব একটা অপছন্দও করছে না এখন পর্যন্ত। অথচ প্রফেসর ব্রাইটের সঙ্গে মোলাকাতের কোনও ব্যবস্থা হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই মোলায়েম আক্ষেপ যখন সে অথর্স লাউঞ্জের কড়া কফির গন্ধে ভোলার চেষ্টা করছিল, তখনই প্রশ্নটা করলেন হাসিমুখ এমিলি, "আর এখানে কী কী দেখার ইচ্ছে তোমার বলো, শুনি?"

স্বয়ং উইলিয়ম ব্রাইটের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছেটা খোদ তাঁর মেয়েকেই যখন বলে ফেলতে পারা গিয়েছে, তখন বাকি ইচ্ছেগুলো চটপট বলেই ফেলা যায়, এমনটা ভেবেই সম্যক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবটা একবার দেখতে পারলে বেশ হত। কিন্তু সে তো অনেকটাই দূর পড়ে যাবে, না? আসলে আমি ছোটবেলা থেকে..."

"ম্যাঞ্চেস্টার... ম্যাঞ্চেস্টার... গিভ মি ওয়ান মোমেন্ট... ওহ ম্যাঞ্চেস্টার...," হঠাৎ বিড়বিড় করতে করতে অথর্স লাউঞ্জের বাইরে ছড়ানো-ছিটনো বাগানটার দিকে টলমল পায়ে এগিয়ে গেলেন এমিলি।

... ম্যাঞ্চেস্টার, হ্যাঁ, ম্যাঞ্চেস্টার অ্যারেনা থেকে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এই খবর, একটু আগে এখানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত ১৭ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে আজ ম্যাঞ্চেস্টার অ্যারেনায় আরিয়ানা গ্রান্দের দ্য ডেঞ্জারাস উওম্যান ট্যুরের একটি কনসার্ট ছিল, যার জন্য তামাম যুক্তরাজ্য জুড়ে উন্মাদনা ছিল কয়েকমাস আগে থাকতেই। আজ সেই অনুষ্ঠান চূড়ান্ত সফলভাবে শেষ হওয়ার ঠিক পরপর, যখন দর্শকরা ম্যাঞ্চেস্টার অ্যারেনা ছেড়ে বেরোচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে একটি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা, মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বেশ কয়েকজনের দেহ। শিল্পী আরিয়ানা গ্রান্দেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ট্যুইট করেছেন, সংবাদমাধ্যমকেও তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এই মুহূর্তের তদন্তসাপেক্ষে যেটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে একটি বিষয় অতি স্পষ্ট, বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছে একজন আত্মঘাতী হামলাকারী। খুব সুচতুরভাবে বিস্ফোরকের সঙ্গে নাট এবং বোল্টকেও আঘাতকারী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার পোলিস। আত্মঘাতী হামলাকারীর কুড়ি মিটারের মধ্যে থাকা মানুষজনের ঘায়েল হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, এটাই জানা যাচ্ছে। গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার পোলিসের ওয়েবসাইটে মৃতদের ও আহতদের তালিকা ঘোষণা করা হচ্ছে, আপনাদের অবগতির জন্য এ-কথা জানানো। সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, ২০০৫ সালের লন্ডন অ্যাটাকের পর যুক্তরাজ্যের বুকে এটিই সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা। ইতিমধ্যেই একটি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের বুকে আরও সন্ত্রাসবাদী হামলার হুমকিও দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শোকজ্ঞাপন করেছেন এবং সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি কড়া বার্তা জানিয়ে বলেছেন, নির্বাচনের মুখে মানুষের রাজনৈতিক অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার এই অপচেষ্টা সফল হবে না কোনওমতেই। বরং যুক্তরাজ্য দেখিয়ে দেবে, তাদের ঐক্য আজও প্রশ্নাতীত। ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলের হাসপাতালগুলিতে ইতিমধ্যেই গুরুতর আহতদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পোলিস ডিপার্টমেন্ট। এ ছাড়া এদিন...

এই গোটা খবরটা, এই সংবাদ পড়ে যাওয়াটা, এই সম্পূর্ণ ধারাবিবরণীটা ব্রিজের উপর দিয়ে দ্রুত মালগাড়ি চলে যাওয়ার মতোই তীব্র ও ভারী গুমগুম স্বরে বেজে উঠতে লাগল এমিলির মাথার ঠিক মাঝখানে, যেখানে চুলগুলোকে, তাঁর ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে একটা ক্লিপ লাগিয়েছিলেন তিনি। সেই ক্লিপটা হঠাৎ খুলে গিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে কালচে লাল খবরের দলা, বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল লাল আওয়াজ করা হুটার, যা প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সের মাথায় ছটফট করে বেড়াচ্ছে, ক্লিপটা খুলে বেরিয়ে আসছে ওয়েবসাইটে একের পর এক ভেসে উঠতে থাকা নিহতদের নামের ফাঁকে থিকথিকে দমবন্ধ করা অপেক্ষার পুঁজ, আর ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের প্রবল আকস্মিক ধাক্কায় ক্লিপটা ছিটকে উঠে যাচ্ছে আকাশে, লাল, স্টেডিয়ামের লাল আলো দিয়ে কাটাকুটি করা আকাশে ছিটকে উঠছে ক্লিপটা, ডিটোনেট করে দিয়ে যাচ্ছে এমিলির একমাত্র মাথা, আর সেই মাথা ফুঁড়ে হাঁচোড়পাঁচোড় করে বুকে হেঁটে শূন্যে উঠে আসছে একজন কমবয়সি লাশ...

একটা ওয়াইন দরকার।

চোখেমুখে জলের ঝাপটা।

একটা চেয়ার।

আর একটু খোলা বাতাস।

বাগান থেকে অথর্স লাউঞ্জে দৌড়ে ঢুকে এলেন মাঝবয়সি আর-এক কর্মকর্তা, এরিস। এঁর সঙ্গে গতকালই একদফা হাসি বিনিময় হয়েছিল ক্যারোল ও সম্যকের, যে-দু'জন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সোফা ছেড়ে, কেননা তাদের কানে এসেছে বাগানে ঘটে চলা কিছু বিলাপ ও সান্ত্বনাসূচক শব্দ, যেদিকে একটু আগে ছুটে গেলেন এমিলি।

"আপনাদের একটা কথা বলা হয়নি, দোষটা আমাদেরই।"

নিজের নেভি ব্লু টাই আলগা করে নিতে নিতে কথাটা বললেন এরিস।

"দয়া করে কেউ, কখনও, এমিলির সামনে ম্যাঞ্চেস্টারের কথা, বা সেই শহর সংক্রান্ত কোনও কিছুর কথা বলবেন না। আপনারা জানেন না, তাই বলে ফেলেছেন। দোষ আপনাদের নয়। আমি জানিয়ে রাখলাম।"

ঘটনা যে কিছু একটা অস্বাভাবিক দিকেই গিয়েছে, ক্যারোল আর সম্যক সেটা গোড়াতেই টের পেয়েছিল। ক্যারোল, কৌতূহলবশত নয়, নেহাত ভদ্রতার খাতিরেই প্রশ্ন করল, "আমরা না-বুঝে কোনও ভুল করে থাকলেও ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু ঘটনাটা কী, তা জানতে পারি?"

এরিস এক মুহূর্ত চুপ করে নীচে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে রেখে। তারপর সটান তাকিয়ে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গতমাসে ম্যাঞ্চেস্টার ব্লাস্টে এমিলি-র একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে। হি ওয়জ় এইটিন অ্যান্ড ওয়জ় ব্লোওন ইনটু পিসেস। সবক'টা টুকরো জোগাড় করাও যায়নি। সেই ঘটনার পর, এটাই এমিলির কামব্যাক। টু ওয়র্ক, টু লাইফ। কিন্তু ওই একটা শব্দ শুনলেই সব ভেঙে যাচ্ছে। ম্যাঞ্চেস্টার। সো, প্লিজ় বি কেয়ারফুল। আসি।"

সম্যক নিজের অজান্তেই তার বাঁ হাতের পাতা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারোলের ডান হাতের পাতা চেপে ধরল। খুব জোরে চেপে ধরল, যতটা চেপে ধরলে দশ আঙুলের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জলও গলতে পারে না। ক্যারোলের আশ্চর্য নরম হাতও, গুটিয়ে আসা ফুলের পাপড়ির মতো মুড়ে এসে নিজের চেটোর মধ্যে ভরে নিল সম্যকের কাঁপতে থাকা হাত। দুটো হাতের রেখা কাটাকুটি হতে থাকল, এক হাতের রেখা এদিক থেকে এসে অন্য হাতের রেখাকে কেটে চলে যেতে লাগল অন্যদিকে, যেভাবে বড় বড় দেশের হাইওয়েগুলো ক্রমাগত, ক্রমাগত কাটাকুটি করতে থাকে নিজেদের মধ্যে, আর সম্যক টের পেতে লাগল, ক্যারোলের হাতের হাইওয়ের উপর ছড়িয়ে আছে নরম আর ঠান্ডা হয়ে আসা টুকরো, ওয়েলশ কেক খাওয়ার পর সে হাত ঝাড়েনি ভাল করে, টুকরোগুলো তাই হাতের পাতার চওড়া প্রান্তরের উপর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে, ছটফট করছে পিষে যেতে-যেতে, কিন্তু তাদের জোড়া দিলেও কিছুতেই একটা সম্পূর্ণ কেক তৈরি হবে না কোনওদিন আর... সম্যকের হাতের পাতার তলায় জড়ো হচ্ছে সেইসব অসম্পূর্ণ টুকরোগুলো... কবরে যাওয়ার আগে...

দশ

পানভোজন সত্যিই মন্দ হয়নি, যেমনটা সকাল-সকাল ডর্মের সামনে এসে বলে গিয়েছিলেন এমিলি। দুপুরে ওই ঘটনা হয়ে যাবার পর ক্যারোল আর সম্যক যথেষ্ট অপরাধবোধ নিয়েই সময় কাটাচ্ছিল কিছুক্ষণ, যা একান্তই স্বাভাবিক, যে-কোনও মানুষের পক্ষে। জেনে আঘাত দেওয়ার মধ্যে না-থাক, না-জেনে আঘাত দেওয়ার মধ্যে থাকে। অপরাধবোধ। অথচ সেই মুহূর্তে, মানে এই বিপর্যয়ের খবর এরিস তাঁদের জানিয়ে দেওয়ার পরেও কিছুতেই অথর্স লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যেতে পারছিল না ওরা। জার্মানি থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি পৃথিবীবিখ্যাত রূপকথাদের বিনির্মাণ করছেন ইদানীং এবং বেশ নামও কুড়িয়েছেন সেই কাজে, তাঁর একটা দীর্ঘ টক ছিল ওই ঘটনার ঠিক পরপরই এবং তার দু'খানা গেস্ট কার্ডও ছিল সম্যক আর ক্যারোলের কাছে, কিন্তু ওরা পাথরের মূর্তির মতো আটকে থাকল অথর্স লাউঞ্জের সোফাটাতেই। সম্ভবত পুরোপুরি অপরাধবোধ থেকেও নয়, কিছুটা আকস্মিকতা আর কিছুটা বিহ্বলতা থেকেও বটে। অবশ্য একটু পরেই, যখন তারা উঠে এমিলি-র খোঁজ করতে যাবে বলে ভাবছে, বাগান থেকে আবার সেই সকালবেলার হাসিটা নিয়ে অথর্স লাউঞ্জে ঢুকে এলেন এমিলি, যাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, একটু আগে ওইভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি, এবং যার গোলগাল দু'হাতে দু'খানা গরম কফির কাগুজে কাপ ধরা।

সম্যক আর ক্যারোল একসঙ্গে ক্ষমা চাইতে যাওয়ার আগেই কফির কাপ দুটো টেবল-এ নামিয়ে দু'জনকে দু'পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ, কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়ালেন এমিলি। তারপর কাপদুটো দু'জনের হাতে তুলে দিয়ে নিজেই উলটে ক্ষমা চেয়ে বললেন, "এত বয়স হয়ে গেল, অথচ আবেগকে এখনও বশ করতে পারিনি। আচ্ছা শোনো, রাতে পার্টির কথা মনে আছে তো? পার্টি মানে ওই আর কী, সকলকেই বলা আছে, যারা-যারা পারবে আসবে। তোমরা এলে কিন্তু এনজয় করবে, আই বেট। গির্জাটা চেনো তো, ওইটাকে ডাইনে রেখে একটু নেমে গিয়ে আবার ডাইনে ঘুরলেই দেখবে, একটা দোতলা বেশ পুরনো কাঠের রেস্তরাঁ, 'দি ওক হাউস'। ওখানেই টেবল বুক করা আছে, সাড়ে আটটার পর যে-কোনও সময় চলে এসো প্লিজ়! এখন দৌড়ই, অনেক কাজ বাকি। দেখা হচ্ছে রাতে..."

টানা কথাগুলো বলে, দ্রুত হাত নেড়ে আর হাসি বিলিয়ে দিয়ে দৌড়লেন ব্যস্ত এমিলি। সম্যকের আর মন ছিল না টক শোনার, সম্ভবত ক্যারোলেরও তাই। দিনের বেলাটা তারা নিজেদের সঙ্গে বিশেষ কথা না-বলে ফেস্টিভাল চত্বরের মধ্যেই এই তাঁবু থেকে সেই তাঁবু, এই দোকান থেকে সেই দোকান এলোমেলো হেঁটে বেড়াল। এসে থেকে এত বড় চত্বরটাই ভাল করে দেখা হয়ে উঠছিল না তাদের, আজ হল একরকম।

'দি ওক হাউস' নামের গম্ভীর বাড়িটা তারা গতকালই দেখেছে, এ-রাস্তা দিয়ে দু'প্রস্থ হেঁটে পার হওয়ার সময়। দেখতেই হয়েছে, কেননা ঠিক এই গম্ভীর রেস্তরাঁটির পাশ দিয়েই একটু ঢালু হয়ে বয়ে যাচ্ছে চওড়া পিচরাস্তা, যাকে ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে সেই নদী, যার জন্য এই শহরের নামকরণ, আর তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাঠের চওড়া সেতু। দেখা হয়নি সম্যকের, কিন্তু কার্ডিফে থাকতেই শান্ত এই নদী আর তার উপরকার সেতুর তারিফ শুনে এসেছে সে, আর ক্যারোল নিশ্চয়ই বহুবার গিয়েছেও সেখানে, এমনটাই ভেবেছে।

এমিলি তো গোড়া থেকেই ছিলেন, রাত ন'টা নাগাদ সম্যক আর ক্যারোল হাজির হয়ে দেখল, ফেস্টিভাল কমিটির অনেকে তো আছেনই, নানা দেশ থেকে আমন্ত্রিত লেখকরাও সানন্দে যোগ দিয়েছেন। এরকম খাওয়াদাওয়ার পরিবেশ ও আয়োজন, দুটোই, হলিউডের পিরিয়ড ফিল্মগুলোয় এর আগে দেখেছে সম্যক, 'ব্রেভ হার্ট' বা 'ট্রয়', এই ধরনের ছবিতে। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের নিচু সিলিং, চারপাশে লণ্ঠন ঝোলানো, আর মোটা পায়ার লম্বাটে টেবল-এর দু'দিক জুড়ে কাঠের চেয়ার, সেই টেবল-এর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সাজানো পানীয়ের পাত্র এবং সুস্বাদু সব খাবারের পিরিচ। একটা বিষয় অবশ্য ওই ফিল্মগুলোতে কখনও শোনেনি সম্যক, যা আজ কেবলই শোনা যাচ্ছিল, তা হল কাচের প্লেটে কাঁটা ও ছুরির ঘষা খাওয়ার কিচকিচে আওয়াজ।

এক পাত্র রেড ওয়াইন।

রাশিয়ান স্যালাড, তিন/চার চামচ।

বেকন-চিজ়ের টুকরো, সঙ্গে ব্লুবেরি-চিজ় সামান্য।

আর-এক পাত্র রেড ওয়াইন।

স্মোকড স্যামন ও কিছু পরিমাণ আলু সেদ্ধ।

আরও এক পাত্র রেড ওয়াইন।

রোস্টেড ল্যাম ও ফ্রায়েড অ্যাসপারাগাস।

আরও এক পাত্র রেড ওয়াইন।

আরও এক পাত্র রেড ওয়াইন।

এবং শেষমেশ আরও এক পাত্র রেড ওয়াইন।

ঘণ্টা দেড়েকের মাথায় যখন এই সমস্ত কিছু সাবাড় করে দিচ্ছে সম্যক, যার খিদে আর তেষ্টা দুইই খুব বেশি ছিল, কেননা দিনভর আর তেমন কিছু খাওয়া বা পান করা হয়নি, তখন হই-হট্টগোলের মধ্যে সে বারবার তাকাচ্ছে নিজের খাবারের প্লেট থেকে অল্প-অল্প করে মাংসের টুকরো মুখে পুরে নিয়ে, ওয়াইন দিয়ে গলা ভিজিয়ে সামান্য হাসি বিলিয়ে কথা বলতে থাকা ক্যারোলের দিকে। ক্যারোলও শুকনো গলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেজাতে পান করে নিয়েছে আধ বোতলেরও বেশি রেড ওয়াইন, সঙ্গে সামান্য সালাড ও মাংস। ক্যারোল এক ফাঁকে ডর্মে গিয়ে পোশাক বদল করে এসেছে বলে এখন তার পরনে একটা ঢোলা হাতা মেরুন পাতলা সোয়েটার, যার নীচে একটা গোল গলা কালো টি শার্ট উঁকি মারছে, আর ঘন নীল রঙের পা-চাপা জিন্স। এই মুহূর্তে ঠিক তার সামনে রাখা একটা মোমের আলোয় তার ত্বকের ভাপ কেঁপে-কেঁপে উঠছে আর বদলে-বদলে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। শেষ তিন পাত্র রেড ওয়াইন হাতে নিয়ে, খেয়াল করেনি সম্যক, সে কেবল তাকিয়েই থেকেছে ক্যারোলের দিকে, তার মুখের দিকে, যার রং মোমের আলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ব্যস্ত তখন।

না-রাঁধা, লালচে বাদামি সোনালি সেমাই এর পায়েসকাঠির মতো পরস্পরের সঙ্গে জড়ামড়ি করে থাকা তার চুলের গুচ্ছ সে সামলাতে জানে ভালভাবেই, তাই তারা কখনওই মোমের সামনে এসে পড়ছে না, কেবল হাসার সময়, সামনের ইরানিয়ান যুবা ঔপন্যাসিকের সঙ্গে কথা চালানোকালীন হাসার সময়, মোমের নরম হলুদ আভা লেগে ঠিকরে উঠছে তার উপরের পাটির একটা দাঁত, যেভাবে আয়না রোদ ফিরিয়ে দেয়, ঠিক সেইভাবে। আর সেইদিকে, টানা চল্লিশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে খেয়াল করেছে সম্যক, কখনও-সখনও ক্যারোলও তাকিয়েছে ফিরে। সম্যক বিশ্বাস করে, মনেপ্রাণে কারও দিকে তাকিয়ে থাকলে তার মগজে গিয়ে সেই তাকানোটা ধাক্কা দেয়, ভারী মোলায়েম ধাক্কা। আর আজও সে বিশ্বাস করল, তার একমনে বুঁদ হয়ে তাকিয়ে থাকার আলতো পেলব ধাক্কার উত্তরেই চারমানুষ-দূর থেকে, যা আসলে মহাকাশের যে-কোনও দুই গ্রহের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়ে কম কিছু নয়, এক-দু'বার হলেও ফিরে তাকিয়ে হাসি ছড়ালো ছিমছাম আর অসাধারণ সেই মানুষটি, যার নাম ক্যারোল।

"তুমি মৃত্যু বিষয়ে কী বলবে বলছিলে সকালে?"

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ হল, রেস্তরাঁর নীচে একদফা আড্ডা আর ধূমপানের শেষে সকলেই শুভরাত্রি বিনিময় করে এগিয়ে পড়েছে পথে-পথে, জম্পেশ একখানা নৈশভোজের পর সামান্য বৃষ্টির হাওয়ায় অল্প পথ হাঁটা বেশ উপভোগ্যই বটে।

সম্যক যখন বেরিয়ে ডর্মের দিকে উঠে যাওয়ার রাস্তাটা ধরে এগোতে যাচ্ছে সবে, তখন তার জ্যাকেটের হাতায় আলতো টান মেরে ক্যারোল বলেছিল, "চলো না, নদীর ধারটায় একটু হেঁটে আসি।"

এই প্রস্তাবে নীরব সম্মতি দেওয়াই সম্যকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সেইমতো তারা এই একটু আগেই 'দি ওক হাউস'-এর পাশের ঢালু আর চওড়া পিচ রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে, যার দু'ধারে রাস্তার আলো তো বেশি নেইই, বরং অনেক দিনের পুরনো লম্বা আর ঝাঁকড়া গাছেদের দল একে অন্যের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি মৃত্যু বিষয়ে কী বলবে বলছিলে সকালে?"

"এখন বলব?"

"ইচ্ছে না-করলে বোলো না। আমার মনে পড়ল হঠাৎ, তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"আসলে কী জানো, আগেও যে মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু এই ফেস্টিভালে এই যে আমরা একসঙ্গে, এই যে দু'জন কবিকে নিয়ে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে..."

"নাহ, তোমার বাক্য গঠনে দেখছি বিশাল সমস্যা থেকে গিয়েছে," অল্প একটু হেসে বলল ক্যারোল। সামনের রাস্তাটা যখন অল্প, খুব অল্প বাঁক নিচ্ছে কোথাও।

"আচ্ছা, সোজাই বলছি তা হলে। তোমার কখনও মনে হয়নি, জীবনানন্দ আর সিলভিয়া, দু'জনেই কী অদ্ভুতভাবে মারা গিয়েছিলেন? পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই কবি, সমসময়েরও নন ঠিক, কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে মৃত্যু তাদের টেনে নিল? মনে হয়নি এ-কথা?"

"হঠাৎ এই নিয়ে ভাবছই-বা কেন সম্যক? কালকের সেশনটা আছে বলে?"

"না না, তা নয়, কালকের সেশনে নিশ্চয়ই এসব কথা উঠবে না, কিন্তু আমি কোথাও একটা লাইন টানার চেষ্টা করছিলাম। দু'জনেই প্রচণ্ড ডিপ্রেসড, দু'জনেরই সংসারে অসম্ভব কলহ, দু'জনেই লিখতে চাইছেন বারবার কিন্তু লিখতে পারছেন না নানা কারণে, দু'জনেই এক দেশ থেকে আর-এক দেশে এসে ঘর বাঁধছেন, দু'জনেই তৈরি করছেন নতুন ভাষা, নতুন ডিকশন, আর দু'জনেই, কী আশ্চর্য আর অস্বাভাবিক ধরনের মৃত্যু ডেকে নিচ্ছেন... মনে হয়নি তোমার কখনও?"

"তোমার এমন মনে হয়েছে বুঝি, খুব মিল আছে?"

"নেই? এই যে এতগুলো দিকের কথা বললাম, মিল নেই?"

"তুমি 'এরিয়েল' আর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র মধ্যে মিল পাও সম্যক? সত্যি পাও? অথবা ধরো 'দ্য বেল জার' আর 'মাল্যবান'-এর মধ্যে? মিল? পাও?"

"আমি সেই মিলের কথা বলছি না ক্যারোল। তুমি তো লেখার কথায় চলে এলে। আমি বলছি..."

"লেখা ছাড়া আর কী দিয়ে একজন কবিকে শনাক্ত করবে তুমি, সম্যক?"

বৃষ্টিটা একইরকম, কেবল এবারে কিছু দূর থেকে বয়ে আসা স্রোতের ঠান্ডা আর তরল শব্দ জুড়ে যাচ্ছে তাতে। একটা পাখি ডাকল কোথাও, গাছের পাতাদের ভিড়ের মধ্যে থেকে, চেনা নয় ডাকটা। আর পিছনে, খুব দূর থেকে না-হলেও, বেশ আবছা হয়ে ভেসে এল গির্জাঘরের ঘড়ির ঘণ্টা, একখানা। ঢং। সাড়ে এগারোটা, না সাড়ে বারোটা, না একটা, বোঝার উপায় নেই।

"আহা, আমি তো লেখার কথা বলছি না ক্যারোল।"

"আমি তো লেখার কথাই বলছি সম্যক, কেবল লেখার কথা বলছি। দু'জনেই মহৎ কবি, সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ বলো, বা সিলভিয়া, কাব্যপ্রতিভা নিয়ে তো প্রশ্ন নেই আমাদের মনে, তাই না? কিন্তু ভেবে বলো তো সম্যক, কোথাও কি এঁদের লেখা পড়বার সময়ে, কোথাও, একটু হলেও, এঁদের অন্যরকম জীবন, তার গতিপ্রকৃতি আমাদের ভাবাতে থাকে? আর সেইসবের অনেক উপরে, এদের আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের প্রভাবিত করে? আমি কি বোঝাতে পারছি তোমাকে?"

"তোমার কি সেইরকম মনে হল আমার কথা শুনে, ক্যারোল? আমি আসলে সিলভিয়ার কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে বারেবারে টের পেয়েছি তাঁর ওই অস্বাভাবিক মৃত্যু। তোমার কাছে তাঁর কবিতা কি সেরকম নয়?"

"আমার কাছে কেমন, সে তো পরের প্রশ্ন। কিন্তু মনে হল বলেই তো বলছি সম্যক, মনে হল বলেই বলছি এভাবে। এটা তোমার নয়, আমাদের অনেকেরই অভ্যেস হয়তো। একজন শিল্পীকে তাঁর জীবনের সঙ্গে এক করে দেখা। আর সেই শিল্পীর যদি অকালমৃত্যু হয়ে থাকে, আর তা যদি তিনি নিজেই ডেকে আনেন, তা হলে তো কথাই নেই। সেই আশ্চর্য জীবন এবং অসহনীয় মৃত্যু আমাদের কাছে তাঁর মহত্ত্বের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। ওঠেই, আমি দেখেছি। জীবনানন্দের কথা ভাবলে তোমার মনে পড়বেই পড়বে, একজন মানুষ ট্রামে কাটা পড়ছেন, গোটা পৃথিবীতে যার নজির নেই। তার সঙ্গে তোমার মনে পড়বেই তাঁর অসহনীয় দারিদ্র, সাংসারিক কলহের একটানা পরিসর, সম্পাদক ও পাঠকদের ধারাবাহিক মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, একের পর এক চাকরিতে ব্যর্থতা, মনে পড়বেই। কী, পড়বে না? কিন্তু এই সব কিছুকে ছাপিয়ে তোমার মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁর মৃত্যু, আশ্চর্য মৃত্যু, শামুকের মতো শ্লথ, নিরীহ এক যানের চাকায় জড়িয়ে-মড়িয়ে অকল্পনীয় ভোগান্তি এবং শেষমেশ মৃত্যু। মনে পড়বেই। পড়তে বাধ্য। আবার সিলভিয়ার কথা ভাবলে তোমার মনে হবেই, ছোটবেলা থেকে একটা মেয়ের কেমন সকলের মাঝে থেকেও একলা হয়ে যাওয়া, সেই অল্প বয়স থেকেই, একটা রোগের মতো, বারবার নিজেকে নিকেশ করে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালানো। তোমার মনে পড়বেই, ওই, জীবনানন্দের মতোই, কিংবা তাঁর চেয়েও সাংঘাতিক ভাবে টেড-এর সঙ্গে দাম্পত্য কলহে জড়িয়ে পড়া সিলভিয়ার, মনে পড়বেই কেবলমাত্র দু'জনেই কবি বলে কী পরিমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গার্হস্থ্য বিরোধ মেনে নিতে হয়েছিল সিলভিয়াকেই, পড়বে তো এসব, তোমার মনে? কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে, আবারও, তোমার মনে পড়ে যাবেই যাবে অভাবনীয়, অতুলনীয় কষ্ট ডেকে আনা সেই আত্মহননের কথা। মনে পড়বেই, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে একজন কবি গ্যাস আভেন খুলে পাইপের মধ্যে নিজের মুখ গুঁজে দিয়ে অকল্পনীয় কষ্ট পেতে-পেতে আত্মহত্যা করছেন। মনে পড়বে না, বলো? ভ্যান গখের কথা উঠলেই ছবিগুলোর পাশাপাশি তোমার কেবল মনে হবে, এই সেই মানুষ যে নিজের কান কেটে ফেলেছিল, নিজেকে গুলি করে শেষ করে দিয়েছিল। মায়াকোভস্কির মতো একজন শক্তিশালী কবির লেখা পড়বার সময়ে কেবল তোমার মাথায় এসে ভিড় করতে চাইবে এই কথাটাই যে, লোকটা বন্দুকের গুলিতে নিজের হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল, কী, করবে না? কিংবা মার্ক রথকো-র মতো আধুনিক একজন শিল্পীর ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুতেই তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না এই সত্যিটা যে, শেষমেশ নিজেকে খতম করে দেওয়ার জন্য ঘুমের বড়ির ওভারডোজ় নিতে হয়েছিল তাঁকে। এটাই স্বাভাবিক, এই বারবার তাঁদের শিল্পের সঙ্গে মৃত্যুর কথা আর অস্বাভাবিক যন্ত্রণার জীবনের কথা মনে পড়ে যাওয়া। কিন্তু একটা সময়ের পর তো তোমাকে ভাবতে হবেই সম্যক, এই অস্বাভাবিক মৃত্যু, এই যন্ত্রণার জীবনের ইতিহাস বাদ দিয়ে দেখলেও কি তাঁরা মহৎ শিল্পী নন? ভিনসেন্ট যদি আশি অবধি বেঁচে থাকতেন আর বিশাল নামডাক, প্রতিপত্তি হত তাঁর, শিল্পী হিসেবে কি কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যেতেন? জীবনানন্দ যদি অনেক বয়সে পক্ষাঘাতে মারা যেতেন আর ততদিনে যদি তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে গিয়ে থাকত, কবি হিসেবে মহত্ত্বের তকমা খোয়াতেন কি তিনি? বা ধরো আজও যদি বেঁচে থাকতেন সিলভিয়া, সাতাশি বছরের বৃদ্ধার সই যদি তুমি নিতে পারতে এই হে ফেস্টিভালে আর তুলতে পারতে কিংবদন্তি কবির সঙ্গে দু'-চারটে সেলফি, তা হলে কি তিনি কম বড় কবি হতেন তোমার কাছে? হতেন না তো, হ্যাঁ? এসব তুমি বা আমি ভাবতে পারছি, কেননা আমাদের কাছে তাঁদের শিল্পের পাশাপাশি তাঁদের জীবনও খোলা খাতার মতো। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি, যারা জীবনানন্দ বা সিলভিয়ার নামও শোনেনি। হঠাৎ হাতে পেয়ে গেলে তারা কীভাবে পড়বে এই দু'জনের কবিতা? কেবল কবিতা হিসেবেই তো? আমাদেরও সেইভাবে পড়ে দেখা উচিত সম্যক। অন্তত একবার।"

সম্যক খেয়াল করেনি, তারা কখন কথা বলতে-বলতে, টিপটিপে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে আস্তে-আস্তে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়াই নদীর উপর সেই কাঠের ব্রিজে। একটা শব্দ, নদীর, কানে এসে লাগছে এখন, ঠান্ডা হাওয়ার পাশাপাশি। সম্যক ক্যারোলের কথার কোনও উত্তর না-দিয়ে, আবার, সোজাসুজি, তার মুখের দিকে তাকাল, যখন ক্যারোল, ব্রিজের হাতলের ওপর ঠেস দিয়ে সটান নদীর দিকে তাকিয়ে আবার বলছে, "আসলে কী জানো, আমার কখনও মনে হয়, এঁদের শিল্পের চেয়ে এঁদের মৃত্যু অনেক বেশি করে দায়ী এঁদের খ্যাতির জন্য, যা আসলে হওয়ার কথা ছিল না। মিথ হয়ে উঠতে গেলে কি শিল্পসৃষ্টিই যথেষ্ট নয়? কিন্তু খেয়াল করে দেখবে, কখনও এঁদের মৃত্যুর থেকে শিল্পকে আলাদা করে দেখা হয় না। মৃত্যুর, অকালমৃত্যুর, অস্বাভাবিক, যন্ত্রণাদায়ক আত্মহননের একটা বাই ডিফল্ট গ্লোরিফিকেশন তৈরি করেছি আমরাই, আর সেই ফাঁদে পড়েছেন এঁরা সকলে। পারলে সেটা থেকে বেরিয়ে এসে এঁদের লেখার দিকে, আঁকার দিকে একবার সোজা চোখে তাকিও সম্যক, দে ডিজ়ার্ভ অ্যান আনবায়াসড লুক।"

সম্যক তাকিয়ে আছে সোজা চোখে, তার পাশে দাঁড়ানো ক্যারোলের দিকে, যার গায়ের সোয়েটার এখন কিছুটা ভিজে লেপটে আছে তার সঙ্গে, চুলের গায়ে মাঝেমধ্যে চকচক করছে জলের বিন্দু, আর থেমে যাওয়া গলার স্বর এখনও যেন এই কাঠের ব্রিজ ছেড়ে কোথাও যায়নি। সম্যক তাকিয়ে আছে। আনবায়াসড লুক। আর ক্যারোলের পাশ ফেরানো, নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা মুখটা কীভাবে যেন, খুব আস্তে-আস্তে কাছে চলে আসছে তার, যখন সে টের পেল, তার শরীরটা একটু-একটু করে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারোলের খুব, খুব বেশিরকম কাছে, যতটা কাছে গেলে আরও একবার ক্যারোলের প্রশ্বাস টের পেতে পারে সে। ওয়াইন। রেড ওয়াইনের লালচে তরল সুগন্ধ ভেসে আসছে ক্যারোলের দুই পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, আর এখন এতটাই কাছে চলে এসেছে সম্যক যে, চাইলে ক্যারোলের ঠোঁটের ওপর বৃষ্টির দানা পড়বার আগে তাকে জিভ দিয়ে শুষে নিতে পারে সে। একটা হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা।

ক্যারোল এবার সটান তার দিকে ঘুরল।

সম্যক সোজাসুজি ক্যারোলের চোখের দিকে, নাহ, নাকের দিকে, নাহ, তাও নয়, সোজা ঠোঁটজোড়ার দিকে তাকিয়ে।

ক্যারোল সম্যকের চোখের দিকে তাকাল। সোজা।

সম্যক নিজের মুখ, নিজের অজান্তেই এগিয়ে নিয়ে গেল ক্যারোলের মুখের দিকে।

ক্যারোল একটা আলতো হাসি ছড়াল, তার দুটো দাঁত দেখিয়ে।

ক্যারোলের বাঁ হাত উঠে এল সম্যকের মাথায়। চুল ঘেঁটে দিল তার। আচ্ছা করে।

তারপর ক্যারোল মুখ ফিরিয়ে নিল নদীর দিকে, দূরের দিকে, সম্যকের মুখ থেকে অন্যদিকে। সম্যক যখন অগত্যা কাঠের ব্রিজের হাতলের ওপর পিঠ ঠেকিয়ে ক্যারোলের ঠিক পাশে, কিন্তু বিপরীত দিকে মুখ দিয়ে রাতের নদীর বয়ে চলা শুনছে, তখন সে আরও শুনল, ক্যারোল বলছে, "সিলভিয়ার কবিতা কেমন লাগে আমার, জানতে চাইছিলে না? অনেক সময়ে, গাঢ় ঘুম হঠাৎ করে ভেঙে যাবার পর, দিগন্তে গোলাপি সূর্য আর চারপাশে ছড়িয়ে পড়া লালচে আভা দেখে ঠাহর করা যায় না, ভোর হচ্ছে, নাকি সন্ধে নামছে। হয় না এরকম? বেশিক্ষণ থাকে না এই ধোঁয়াশা, কিন্তু পাঁচ-দশ সেকেন্ডের জন্য আমরা কেমন যেন সময়হারা হয়ে পড়ি। অসহায় লাগতে শুরু করে। তখন আমরা প্রাণপণ মনে করার চেষ্টা করি, কখন ঘুমিয়েছিলাম। এইটা মনে করতে পারলেই অঙ্কটা মিলে যায়। কিন্তু যতক্ষণ-না মনে করতে পারছি, ততক্ষণ আমি আমার চারপাশের প্রহরটাকে অনুবাদ করতে পারছি না। তাই না? সূর্য তো চেনা, আকাশ চেনা, গাছপালা চেনা, বাড়িঘর চেনা, সব কিছু পরিচিত। কেবল সময়টা ঠাহর হচ্ছে না বলে অস্বস্তি হচ্ছে, অসহায় লাগছে। সময় আসলে সেই অনুবাদক। তাকে টেনে আনতে না-পারা পর্যন্ত ওই দৃশ্য এক দুর্বোধ্য কবিতার মতো, যা তোমার ভাষাতেই লেখা, কিন্তু তুমি কিছুতেই তাকে বুঝে উঠতে পারছ না। সিলভিয়ার কবিতা কখনও-কখনও আমার কাছে ঘুম ভেঙে হঠাৎ দেখতে পাওয়া সেই জানলার বাইরেটার মতোই, যে ভারী চেনা হয়েও আমাকে অসহায়তার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। আমি যতক্ষণ-না আমার সময় দিয়ে তাকে অনুবাদ করে নিতে পারছি।"

বৃষ্টি, এই এতক্ষণ অপেক্ষার পর, ঝমঝমিয়ে নেমে এল কাঠের ব্রিজটার ওপর।

এগারো

"হরিণেরা কখন জল খেতে আসবে বাবা?"

"দেরি আছে সোনা, এখনও বেশ খানিকটা দেরি আছে তাদের আসতে।"

"তা হলে ততক্ষণ কী হবে? অনেক রাত অবধি জাগতে হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অনেক না-হলেও, একটু রাত অবধি তো জাগতেই হবে, যদি তুমি আদৌ হরিণদের দেখতে চাও।"

"আমি তো চাই হরিণদের দেখতে, যখন ওরা জল খেতে আসবে। তুমি তো বলেছিলে, আমাকে ওদের জল খেতে আসার গল্প শোনাবে আজ।"

"শোনাচ্ছি তো সোনা, এই তো শোনাচ্ছি। আগে তো আমাদের ঢুকতে হবে সেই অরণ্যে, যেখানে কোথাও-না-কোথাও হরিণেরা থাকে... ঝাঁক বেঁধে থাকে..."

"ঝাঁক বেঁধে থাকে?"

"ঝাঁক বেঁধে থাকে। একলা ওরা চলাফেরা করে না বড় একটা। যদি কোনও বিপদ এসে পড়ে?"

"কী বিপদ বাবা?"

"কতরকম বিপদ আছে সোনা, কত হিংস্র জানোয়ার আছে, সাপখোপ আছে... আর তারপর, তারপর ধরো যদি ওরা একা-একা রাস্তা হারিয়ে ফেলে?"

"খুব বড় অরণ্য বুঝি?"

"খুব বড় অরণ্য। খুউব। এপার থেকে যার ওপার দেখা যায় না, সেইরকম অরণ্য। একটা পাহাড়ের ঢাল থেকে শুরু হয়ে সে নেমে এসেছে সমতলে, আর বয়ে গেছে অনেক, অনেকটা দূর পর্যন্ত। লোকে বলে, এমনকী পাহাড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেও সেই অরণ্যের শেষ ভালমতো দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল ক্যানোপি দেখা যায়।"

"ক্যানোপি কী বাবা?"

"গাছেদের পাতাভর্তি মাথা যখন একজনের সঙ্গে আর-একজন মিশে গিয়ে পাতার ছাতা তৈরি করে, তখন তাকে বলে ক্যানোপি, বুঝলে সোনা?"

"হুম।"

"তা, পাহাড়ের ঢালে সেই অরণ্য কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত ক্যানোপি বিছিয়ে রেখেছে। এত ঘন সেই অরণ্য যে, মানুষ কোনওদিন তার ভেতরে বেশিদূর ঢুকতেই পারেনি। সেখানে কোন কোন পশুপাখি আছে, মানুষ জানে না। কোন কোন প্রাচীন আর দুর্লভ সব গাছ আছে, মানুষ জানে না। কোথাও নদীর তলায়, কোথাও বালিতে, কোথাও ঝরনার নীচে বা কোথাও কোনও গুহার মধ্যে গুপ্তধন লুকনো আছে কি না, মানুষ জানে না।"

"গুপ্তধন কি সত্যিই আছে, বাবা?"

"আমিই-বা কী করে জানব বলো, আমিও তো একজন মানুষ। আমিও তো সেই অরণ্যে ঢুকিনি।"

"তা হলে তুমি হরিণদের গল্প কোত্থেকে জানলে?"

"আমাকেও, এইরকমই এক বরফের রাত্তিরে, ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে, আমার বাবা শুনিয়েছিলেন এই গল্প।"

"আচ্ছা, এবার তুমি অরণ্যের গল্পে ফেরো। সেখানে কি ঠান্ডা খুব?"

"রাতের দিকে খুব ঠান্ডা। আসলে, ওই যে পাহাড়, অরণ্যের মাথার কাছে তার বাবার মতোই দাঁড়িয়ে, সেই পাহাড়ের মাথায় থাকে সারা বছর বরফ। তাই সেই পাহাড়ের বেগুনি-বাদামি ঢাল বেয়ে, সারা বছর ঠান্ডা বাতাস নেমে আসতে থাকে নীচে। নেমে আসতে-আসতে তারা গাছেদের গুঁড়ির আড়াআড়ি ফাঁক দিয়ে, বাচ্চা আর দুষ্টু ছেলেমেয়েদের মতোই ঢুকে পড়ে সেই অরণ্যে। সেই শীতল আর দ্রুত বাতাস, অরণ্যের মেঝেতে জড়ো হতে থাকা নতুন-নতুন শুকনো পাতাকে খসখস শব্দে ওলটপালট করে, লম্বা-লম্বা বৃদ্ধ গাছেদের ঘন পাতার চাদরে সরসর শব্দ তৈরি করে, ছুটে যেতে থাকে অরণ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। তাই সকাল থেকে রাত হয়ে আবার ভোর পর্যন্ত খুব ঠান্ডা থাকে অরণ্য।"

"আর ফায়ারপ্লেস?"

"অরণ্যে কোথাও কোনও ফায়ারপ্লেস নেই সোনা, ফায়ারপ্লেস তো মানুষের তৈরি জিনিস। আর অরণ্য খুব নির্ভীক হলেও, আগুনকে সে ভারী ভয় পায়। গাছেদের শরীর তো কাঠ দিয়ে তৈরি, আর কাঠের কাজই হল আগুন পেলে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই কোনওভাবে একবার যদি আগুন অরণ্যের মধ্যে পৌঁছয়, তা হলে সে যত বড় অরণ্যই হোক না কেন, তাকে পুড়িয়ে এক্কেবারে ছাই করে দিতে বেশি সময় নেয় না।"

"হুম। এখন কি অরণ্যে রাত, বাবা?"

"কে বলতে পারে... হয়তো রাত। ছমছমে, নিস্তব্ধ, ঠান্ডা আর প্রায় অন্ধকার একটা রাত হয়তো এখন। কেবল পাতার সরে-সরে যাবার খসখসে আওয়াজ আছে। দূরে কাছে অজানা অচেনা কিছু পাখি, রাতে যাদের ঘুম আসে না কিছুতেই, তারা ডাকছে একটু-একটু। হয়তো কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। গাছ থেকে গাছে হয়তো লাফিয়ে যাচ্ছে লেমুর বা কাঠবেড়ালি, টুপটাপ কিছু পাতা এত রাতেও খসে পড়ছে তাই। অদ্ভুত সব পোকার ডাক দূর থেকে ঝমঝম করে ভেসে আসছে। হয়তো চাঁদ উঠেছে খুব। জেদি ক্যানোপি ভেদ করে তার অল্প-অল্প জ্যোৎস্না এসে পড়েছে অরণ্যের পাতাভর্তি মেঝেয়। দু'শো, তিনশো বছরের বুড়ো-বুড়ি গাছেদের গায়ে শ্যাওলা জমেছে কোথাও-কোথাও, তাদের গুঁড়ির গায়ে তাই ভিজে-ভিজে ভাব। সেই ভিজে ভাব জ্যোৎস্না লেগে কেমন যেন চকমক করে উঠছে মাঝে মাঝে। জোনাকি আছে কিছু, তারা আপনমনে ভেসে বেড়াচ্ছে অরণ্যের মধ্যে, যেদিকে তাদের মন চায়। গোটা অরণ্যটা, রাতের অল্প জ্যোৎস্নায় ছমছম করছে এখন। তুমি দেখতে পাচ্ছ, সোনা?"

"হ্যাঁ বাবা, পাচ্ছি। কিন্তু পিটার আর মেরি কোথায়? ওদের কটেজটা কোথায়?"

"পিটার আর মেরি তো অন্য গল্পে। ওদের কটেজ তো ফেয়ারি গ্রামে। সেখানে তো এখন দিনের বেলা, পিটার কাজে গেছে, মেরি গেছে বাজারে। কটেজে তালা ঝুলছে। ওরা ফিরলে তবে না আমরা ওদের গল্প করব? এখন তো এই অরণ্যে আছি।"

"আচ্ছা। তা হলে হরিণদের কথা বলো এবার?"

"এইবারেই তো হরিণেরা বেরোবে। তাদের সারা দিন ছোটাছুটি হয়ে গেছে, ঘুরে-ঘুরে ঘাস খাওয়া হয়ে গেছে, একে অন্যের সঙ্গে শিঙের লড়াই হয়ে গেছে, এবারে তারা ক্লান্ত। গায়ে জ্যোৎস্না পড়লেও ব্যথা লাগছে, এইরকম।"

"ওরা তা হলে এখন কোথায় যাবে বাবা?"

"সেইটাই তো বলছি। পথে কিন্তু ভালুক আসতে পারে, রোমশ, বড় ভালুক। ওরা হরিণদের শিকার করতে বড্ড ভালবাসে। চিতাও আসতে পারে, যারা গাছের ডালে-ডালে ওত পেতে থাকে, তারাও হরিণদের জন্য অপেক্ষা করে কিন্তু। হরিণের গল্পে যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তুমি ভয় পাবে না তো?"

"তুমি তো আছো, আমি একদম ভয় পাবো না।"

"আচ্ছা। তা হলে বলি শোনো। এই যে ক্যানোপির কথা বলছি বারবার, গাছের পাতাভর্তি মাথা দিয়ে তৈরি ছাতা, ছাউনি, শামিয়ানা? বলছি তো?"

"হুঁ।"

"অরণ্যের ঠিক মাঝবরাবর, কেন কে জানে, এই ক্যানোপি একটু ফিকে হতে-হতে একসময়ে দু'পাশে সরে গিয়ে আকাশকে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে। যেমন তোমার মাথার দু'পাশে চুল ভাগ হয়ে গিয়ে মাঝখানে একটা সরু রেখা চলে গেছে, ঠিক সেইরকম। পাহাড়ের চুড়ো থেকে দেখলে মনে হবে, কেউ যেন অরণ্যের গাল টিপে ধরে পরিপাটি করে তার চুল আঁচড়ে দিয়েছে দু'দিকে। আর মাঝে পড়ে রয়েছে ওই সরু পথ, যেখান থেকে আকাশ তার রোদ্দুর আর জ্যোৎস্না পাঠাতে পারে নীচে। বুঝলে?"

"হুম।"

"আর কী আশ্চর্য ব্যাপার, ঠিক যেখানে ওই ক্যানোপির চেরা ফাঁক, তার নীচেই, অনেক-অনেক নীচে, অরণ্যের মেঝেতে বয়ে যাচ্ছে খুব পাতলা আর স্বচ্ছ একটা নদী। জ্যোৎস্না পড়ে ঠিকরে উঠছে তার জল থেকে, আর মনে হচ্ছে, যেন অরণ্যের হাতের শিরা বেয়ে রুপোলি রক্ত বয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ঠিক নদী তাকে বলা যায় না, কেননা এতই পাতলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে, বরং বলা যেতে পারে জলধারা। অরণ্যের নানা জায়গায় সে ইচ্ছে মতো বাঁক নিয়েছে। কোথাও তার উপরে হেলে পড়েছে প্রাচীন বৃক্ষ, তো কোথাও সেতুর মতো তার এপাশ থেকে ওপাশ পড়ে আছে পাথরের দল, কিন্তু এইসব কিছুর তোয়াক্কা না-করেই সে অরণ্যের এদিক থেকে ওদিক চিরে বয়ে চলেছে তিরতির শব্দে। হ্যাঁ, এই একটা শব্দের কথা বলতে আমি তোমায় ভুলে গেছিলাম তখন। এই নদীটার বয়ে যাবার তরল শব্দ, যা অরণ্যের যে-কোনও প্রান্তে কান পাতলেই শোনা যায়।"

"খুব জোরে শব্দ করে নদীটা, বাবা?"

"উঁহু, একেবারেই না। খুব আস্তে। খুব মিহি। খুব নিচু শব্দ। এমন শব্দই বহু-বহু দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়, জোর শব্দ বেশি দূর যেতে পারে না।"

"আচ্ছা। তারপর কী হল?"

"তারপর, দিন আর সন্ধের ক্লান্তির পর, ঝাঁক বেঁধে হরিণেরা, ওই জ্যোৎস্নার মধ্যে রওনা দিল জল খাবে বলে। জলের তো একটাই ঠিকানা, এই ছোট্ট নদীটা। হরিণেরা যেদিকটায় থাকে, তার কাছাকাছি কোথাও এক জায়গা দিয়ে অবশ্যই বয়ে যাচ্ছে সে, সেখানেই একটু পরে হাজির হবে হরিণদের দল। নদীটা কিন্তু বেশি গভীরও নয়। এই তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত হবে তার গভীরতা। নদীর মেঝেয় এলিয়ে পড়ে আছে নানা রঙের, নানা আকৃতির সব নুড়িপাথর। কারও রং নীল, কারও বাদামি, কারও ধূসর তো কারও ছাই-ছাই। আর তার জল এতই স্বচ্ছ, উপর থেকে প্রত্যেকটা নুড়ি আলাদা করে দেখা যায়। বিশেষত যখন দিনের বেলা। জ্যোৎস্নাতেও এমনকী তাদের রঙের তফাতটুকু অন্তত বোঝা যায়।"

"অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তো। এইবারে কি হরিণেরা এল জলের ধারে?"

"এইবারে এল। তাদের পথ খুঁজে আসতে, একটু দেরি হয়ে গেল। সার বেঁধে, ঠিক পিয়ানোর রিডের মতো এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জলে মুখ নামাল হরিণেরা।"

"ওরা জল খেল, বাবা?"

"জল তো খাবেই সোনা, জল খেতেই তো এসেছে। কিন্তু জল খাওয়ার আগে, মুখ নামিয়ে, নদীতে ওরা কী দেখল বলো তো?"

"কী দেখল?"

"ওরা প্রত্যেকে নদীর জলে দেখল নিজেদের মুখ। নিজেদের সুন্দর মুখের ছায়া ওরা দেখতে পেল সেই ছোট্ট আর পাতলা নদীর জলে। দেখতে পেল নিজেদের চোখ, নাক, বাদামি চামড়া আর প্যাঁচানো শিং। শুধু কি তাই? ওরা দেখতে পেল আশেপাশের গাছেদের ছায়া, মাথার উপরকার পাতার আলগা ঢাকনার ছায়া, এমনকী এই সব কিছুর উপরে একফালি আকাশের প্রতিফলন ওরা দেখতে পেল ওইটুকু বয়ে যাওয়া জলধারার মধ্যে। আর বয়ে যাচ্ছে বলেই, সেই দেখতে পাওয়া এই থাকছে, তো এই ভেঙে যাচ্ছে। সবই স্পষ্ট, কিন্তু সবই ভাঙা-ভাঙা। আসল চেহারার মতো স্থির নয়, জোড়ালাগা নয়। নিজেদের তরল প্রতিফলন দেখতে পেল হরিণেরা। আর অবাক হল। বুঝলে?"

"হুম।"

"তা হলে এবার বলো তো, এই ছোট্ট নদীটার নাম কী?"

"উমম... আমি জানি না তো। তুমি বলো। তুমি দেখেছ নদীটা?"

"খুব দূর থেকে এক আধবার দেখতে পেয়েছি। হয়তো স্বপ্নে..."

"তা হলে তুমি বলো বাবা, কী নাম নদীটার?"

"অনুবাদ।"

এই শেষ শব্দটার আবছা আর প্রতিধ্বনিময় উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বরাদ্দ ছোট্ট ঘরটার বিছানায় খুব ধীরে বালিশের থেকে ভেসে উঠল ক্যারোল। ওয়াইন আজ কিছুটা বেশিই পান করা হয়ে গিয়েছিল, নইলে সে সাধারণত নিজের ছোটবেলা স্বপ্নে দেখতে পায় না তেমন, যদিও বলাই বাহুল্য, যেমন সে বলছিলও সম্যককে, তার ছোটবেলা ছিল অনেক-অনেক বাচ্চার চেয়ে অন্যরকম, ভাল ও মনে রাখবার মতোই।

মাথার কাছে রাখা ফোনের অন্ধকার স্ক্রিনের উপর নীলচে-সবুজ রঙের সময়সূচক ভেসে বেড়াচ্ছে, যেন অন্ধকারে জোনাকিরা সময় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অরণ্যের এদিক থেকে সেদিক। রাত আড়াইটে। এসব অনভ্যস্ত সময়ে ঘুম ভেঙে গেলে ভারী অসহায় লাগে ক্যারোলের, মাথার মধ্যে একসঙ্গে ঝাঁপ মারতে চায় শেষ-করে-না-উঠতে-পারা কাজের ঝাঁক, যাদের কথা অন্তত এখন সে ভাবতেই চায় না কিছুতে। বরং অন্ধকার এই ঘরে, যার বাইরে বয়ে যাচ্ছে বইয়ের-দোকান-ঘেরা, নদীর পাড়ঘেঁষা ছোট্ট এক শহর, সে ভাবতে চায় সেইসব শীতের, তুষারপাতের রাতগুলোর কথা, যখন সারা দিনের কাজ থেকে ফিরে, ফায়ারপ্লেসের ধারে, সোফার উপর তাকে কোলে চাপিয়ে বসে বাবা শোনাতেন এইরকম সমস্ত গল্প। রূপকথা ছিল না সেখানে, মারপিট ছিল না। পরে বড় হয়ে ভেবে দেখেছে ক্যারোল, আসলে কিছুই তেমন ছিল না, যা-যা বাচ্চাদের বলা গল্পগুলোয় থাকে।

আপাতত ভাবনা বাদ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সে এল কমন কিচেনে। এই হেঁশেলের তিনদিকে তিনখানা থাকার ঘর। একটা ঘরে সে, উলটো দিকের ঘরে সম্যক। আর একজন আলজিরিয়ান ঔপন্যাসিক আজই আর-একখানা ঘর খালি করে স্কটল্যান্ড পাড়ি দিয়েছেন বলে, সে পড়ে আছে খালি হয়ে। ক্যারোল ছোটবেলা থেকেই, অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় বলেই, আলো জ্বালাল না হেঁশেলে। বরং অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ দরজা খোলার পর ছড়িয়ে পড়া ফ্রিজের ঠান্ডা সবজেটে আলো তার বরাবর দিব্যি লাগে।

এই যখন সে ফ্রিজের দরজা খুলছে আর বের করে আনছে ঝকঝকে এক বোতল ঠান্ডা জল, তখনই সে টের পাচ্ছে, হেঁশেলের দেওয়াল বরাবর একখানা ঘরের দরজা বন্ধ করা নেই। অল্প খোলা, আর সেখান থেকেও, সেই দরজার ফাঁক গলেও বেরিয়ে আসছে সবজেটে আলো একখানা, সম্ভবত বেডসাইড ল্যাম্পের। সম্যক কি ঘুমোয়নি তা হলে?

সামান্য একটা কি দুটো টোকা দিয়ে সম্যকের ঘরে ঢুকে ক্যারোল দেখল, জানলার পাশে সেঁটে রাখা একজন-মানুষ-ধরার-মতো একফালি বিছানায় একজন সম্যক শুয়ে আছে। ক্লান্ত। ঘুমন্ত। চশমা খুলে সাইড টেবল-এ রাখা। অল্প-অল্প নড়ছে তার ঠোঁট। অনেক সময়ে সারা দিনের না-বলতে-পারা কথা মানুষ ঘুমের মধ্যে বলে ফেলতে চায়। সেইরকমই কিছু হতে পারে। ক্যারোল, ওই একফালির মধ্যেই, সম্যকের শরীরের পাশে আরও এক সরু ফালি বের করে নিয়ে খুব আলতো বসল এলোমেলো বিছানায়। তারপর সম্যকের অল্প তপ্ত কপালে একবার নিজের বাঁ হাতের পাতা রাখল। জ্বর এসেছে কি?

এইরকমটা যখন ক্যারোল ভাবছে সম্যকের তেতে ওঠা কপালের গায়ে হাত রেখে, তখন তার কপালের নীচে, অনেক নীচে, হয়তো বা কয়েক হাজার মিটার নীচে সোজাসুজি নেমে যাবার পর, সম্যকের ঘুমের ঠিক কেন্দ্রে আসলে তেতে উঠছে দুপুরের মরুভূমি। জুন মাসের ঠা-ঠা দুপুরের রোদ পড়ছে একের পর এক পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে থাকা বালিয়াড়িদের শরীরে আর সেইসব বালি থেকে ঠিকরে উঠছে গরমের ভাপ। কিন্তু সেই হাড়মাস পুড়িয়ে নিমেষে কয়লা করে দেওয়া গরমের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে সম্যক। যেমন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশের সকলে, যাদের প্রত্যেকের চোখে একটা করে গাঢ় কালো চশমা, যেমনটা নাকি সম্যকের চোখেও আঁটা আছে এই মুহূর্তে। সব মিলিয়ে শ'দুয়েক মানুষের থিকথিকে একখানা ভিড়, যার গুঞ্জন তাকে ভিড়ের চেয়েও বেশি করে জটলা বানিয়ে তুলেছে আসলে। অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের এই তাপমাত্রার মরুভূমিতে দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে কী করছে এতজন মিলে? এই অচেনা, সানগ্লাস-পরা লোকেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্যক কী করছে এখন? তারা সকলে দেখতে এসেছে ভোজবাজি। ম্যাজিক। সূর্যগ্রহণের মতো এইসব ম্যাজিকও কালো চশমা পরে দেখতে হয়, তাই যারা-যারা এসেছে, সানগ্লাস পরে তৈরি হয়েই এসেছে।

এই জটলার সামনে, দিগন্ত অবধি ছড়িয়ে থাকা তপ্ত বালিয়াড়ি, আর সেইসমস্ত কিছুর পিছনে, গম্ভীর হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

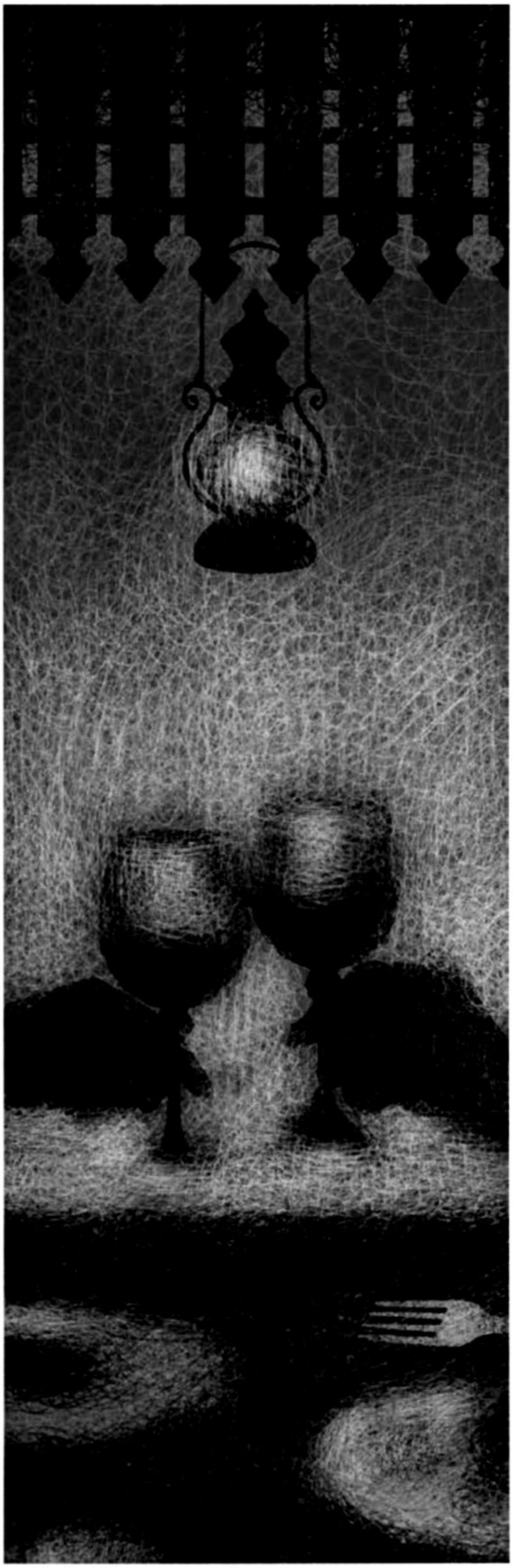

কাঠের নিচু সিলিং, চারপাশে লণ্ঠন ঝোলানো... এক পাত্র রেড ওয়াইন।

একটি নীল পর্বত। এমন পাহাড় আগে কোথাও দ্যাখেনি সম্যক, অন্তত মরুভূমির মধ্যে তো নয়ই। আর পাহাড় থেকে শুরু হয়ে এই অবধি বয়ে আসা বালিয়াড়িদের মসৃণ ঢেউখেলানো শরীরের ওপর, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ডাকের সাজের মতো পুরনো সব কঙ্কাল। কেবল বহু দূরে কীভাবে যেন দাঁড়িয়ে আছে একখানা গাছের কাঠামো, যার গায়ে পাতা নেই কোনও। আসলে সেও কঙ্কালই, গাছের। আর তার শীর্ণ ডালে বসে আছে কালো একজন পাখি। একমুহূর্ত দেখে মনে হবে, যেন দালির ছবির মধ্যে বেড়াতে আসা হয়েছে সকলের।

আর এই সব কিছুর মধ্যেই একটা হঠাৎ-উঠে-দাঁড়ানো ইটভাটা। একটা গোলাটে চুল্লি, কুতুব মিনারের মতো, শহিদ মিনারের মতো যার আকৃতি, দাঁড়িয়ে আছে মরুভূমির বালির ওপর, যার একপাশে সদ্য তৈরি হাতে-গরম ইট দিয়েই সাজানো হয়েছে মঞ্চ। মঞ্চের ওপর, এই সানগ্লাসের মধ্যে থেকেই দেখতে পাচ্ছে সম্যক, দাঁড়িয়ে আছেন কালো পোশাক পরা জাদুকর, তাঁর চোখেও কালো চশমা পরা সকলের মতো। কার সঙ্গে যেন ভারী মিল ভদ্রলোকের। কালো লং কোট, চেক কাটা হ্যাট, তীক্ষ্ণ আর সন্দেহপ্রবণ নাক, পাতলা ঠোঁট, আর ঠোঁটে গোঁজা পুরনো আমলের পাইপ একখানা। কোথায়, ঠিক কোথায় তাঁকে দেখেছে এর আগে, ভাবতে-ভাবতেই এক লহমায় জাদুকরকে চিনতে পারল সম্যক। এর সঙ্গেই তো আগের দিন পথ চলতে গিয়ে আর-একটু হলে ধাক্কা খাচ্ছিল সে। হোমস। শার্লক হোমস। কিন্তু তিনি তো ডিটেকটিভ। এই গরমের হলকা-ওঠা দুপুরের মরুভূমিতে হঠাৎ লোক জড়ো করে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন কেন? ভাবতে-ভাবতেই খেয়াল করল সম্যক, তিনি, জাদুকররূপী শার্লক, এই ম্যাজিক শুরুর আগেই, মাথা নুইয়ে, টুপি খুলে কুড়িয়ে নিতে চাইছেন সকলের অভিবাদন, আর তাঁর সেই ভঙ্গিই থামিয়ে দিচ্ছে দর্শকদের কৌতূহলী গুঞ্জনকে।

গরম একখানা দাপুটে হাওয়া বয়ে আসছে বালিয়াড়ির দিক থেকে, অনেক দর্শকই হাতে ঢেকে নিচ্ছেন নাক-মুখ। এমন সময়, দেখা গেল, বছর ত্রিশেকের একটি মেয়ে মই লাগিয়ে উঠে যাচ্ছে ইটভাটার চুল্লির সরু-হয়ে-আসা চূড়োর দিকে। তার ভ্রুক্ষেপ নেই কোনও তরফেই, আর সে পরে আছে সার্কাসের ট্র্যাপিজ-দেখানো মেয়েদের মতো আকর্ষণীয় ও আঁটসাঁট একখানা পোশাক। তার চোখে কোনও চাহনি নেই। এটা সম্যক বুঝতে পারছে দিব্যি, কেননা এই গোটা ব্যাপারটায় একমাত্র মেয়েটির চোখেই চশমা আঁটা নেই।

সে তাকিয়ে থাকত মেয়েটির দিকেই, যদি-না হঠাৎ সেই জাদুকর লোকটি কিচ্ছু না-বলেকয়ে সোজা জাদুমন্ত্র পড়া শুরু করত। জাদুকর দু'পাশে নিজের দু'হাত প্রসারিত করে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে খোনামতো সরু ও তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছেন—

What was she doing when it blew in
Over the seven hills, the red furrow, the blue mountain?
Was she arranging cups? It is important.
Was she at the window, listening?
In that valley the train shrieks echo like souls on hooks.

That is the valley of death, though the cows thrive.
In her garden the lies were shaking out their moist silks
And the eyes of the killer moving sluglike and sidelong,
Unable to face the fingers, those egotists.
The fingers were tamping a woman into a wall,

এই পর্যন্ত বলে, জাদুকর হাত তুলে ইশারা করছেন যেদিকে, সেদিকে তাকিয়ে সম্যক এবং বাকি দর্শকের নজরে গেল যে, মেয়েটি, সেই ট্র্যাপিজের পোশাক-পরা বছর ত্রিশেকের মেয়েটি ততক্ষণে মইয়ের একেবারে শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। তার চোখে তখনও কোনও দৃষ্টি নেই। তার মাথা আর ইটভাটার গনগনে চুল্লির মুখের মধ্যে বড়জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুট দুয়েকের দূরত্ব। এ কেমন ম্যাজিক? কী করবে মেয়েটা এরপর? কী করতে পারে সে...? এমনটা যখন ভাবছে সম্যক, জাদুকর ফের বলে উঠছেন—

A body into a pipe, and the smoke rising.
This is the smell of years burning, here in the kitchen,
These are the deceits, tacked up like family photographs,
And this is a man, look at his smile,
The death weapon? No-one is dead.

There is no body in the house at all.
There is the smell of polish, there are plush carpets.
There is the sunlight, playing its blades,
Bored hoodlum in a red room
Where the wireless talks to itself like an elderly relative.

Did it come like an arrow, did it come like a knife?
Which of the poisons is it?
Which of the nerve-curlers, the convulsors? Did it electrify?
This is a case without a body.
The body does not come into it at all.

It is a case of vaporization.
The mouth first, its absence reported
In the second year. It had been insatiable
And in punishment was hung out like brown fruit
To wrinkle and dry.

এই এত দীর্ঘ মন্ত্র যখন আওড়াচ্ছেন জাদুকর, তখন কেউ আর জাদুকরের দিকে তাকিয়ে নেই। কেননা, সকলে হাঁ করে দমবন্ধ অবস্থায় দেখছে, কীভাবে ওই মেয়ে, মন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মাথা, নিজের জ্যান্ত মাথাখানা বাধ্য কোনও পশুর মতোই আস্তে-আস্তে, খুউব আস্তে-আস্তে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আগুনের ধক-পুষে-রাখা চুল্লির গনগনে মুখের মধ্যে। ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার খুলে রাখা দু'চোখ, সেঁটে রাখা দু'ঠোঁট, দু'কান আর নাক, ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার চড়মড় করে জ্বলে ওঠা, শক্ত করে পিছটান মেরে বাঁধা বাদামি চুলের গুচ্ছ, ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অথচ টুঁ শব্দ করছে না মুখে। মুখ, তার ত্রিশ বছরের মুখ তখন চুল্লির ভেতরে ঢুকে গিয়ে শুষে নিচ্ছে মাটি থেকে উঠে আসা, হিংস্র আগুনের হলকা আর ভাপ... তার মুখের নরম, মোলায়েম, ক্লান্ত চামড়া তখন কুঁচকে আর ঝলসে যেতে থাকছে অকল্পনীয় তাপের ধাক্কায়-ধাক্কায়, যখন নীচে, সকলের কানে, দূর থেকে ঢুকছে জাদুকরের মন্ত্রের শেষাংশ -

The breasts next.
These were harder, two white stones.
The milk came yellow, then blue and sweet as water.
There was no absence of lips, there were two children,
But their bones showed, and the moon smiles.

Then the dry wood, the gates,
The brown motherly furrows, the whole estate.
We walk on air, Watson.
There is only the moon, embalmed in phosphorus.
There is only a crow in a tree. Make notes.

এইটুকু বলামাত্র, ঝপ করে মরুভূমিতে নেমে আসছে প্রবল জ্যোৎস্নার রাত, আর তাপ শুষে নেবার ধাক্কায়, ভাপ হজম করতে থাকার চোটে, হলকা গিলে নেবার কারণে, কালো সেই ট্র্যাপিজের পোশাক ফাটিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে খেলা দেখানো মেয়েটির নিষ্প্রাণ দুই বুক, যেন কবেকার তৈরি দু'খানা শ্বেতপাথরের চাঁদ। ইটভাটার সেই মানুষ-গেলা চুল্লির মুখ থেকে তখন চামড়া-পোড়া ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর এক ঝটকায় মেয়েটির স্তন পাথরের হয়ে যাওয়ায় সকলে হাততালি দিচ্ছে, যেন কোত্থাও কোনও পোড়া গন্ধ নেই।

সম্যক মাঝখান থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলে নাকে হাতচাপা দিয়েছে, আর সটান তাকিয়ে ফেলেছে মেয়েটির পাথর হয়ে যাওয়া বুক দুটোর দিকে। যে-দু'খানা বুক থেকে কাঠ হয়ে যাওয়া দুই উন্মুখ বৃন্ত এবার খসে পড়ছে, যেভাবে খসে পড়ে সিগারেটের মুখের ছাই। চারপাশের হাততালি তার কানে ম্লান হয়ে আসছে, সে কেবল হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওই জোড়া বুকের দিকে। আর তাকিয়ে আছে বলেই খেয়াল করেনি, কখন শার্লকরূপী জাদুকর ইটের মঞ্চ থেকে নেমে দৌড়ে এসে চেপে ধরেছে সম্যকের কলার, আর নিজের খোনা, তীক্ষ্ণ, সরু স্বরে দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে তার কানে মুখ রেখে বলছে, “সাবটাইটল পড়া হচ্ছে, হ্যাঁ? সাবটাইটল? স্বপ্নে সাবটাইটল হয় না, সেটা জানেন না আপনি? মাজাকি হচ্ছে এখানে? রাসকেল কোথাকার!”

বারো

আমার ছোট্ট মেয়ে ক্যারোল,

শুধু চিঠি লিখব বললেই তো হয় না, তার একটা বিষয়বস্তু থাকতেই হয়— এইরকম ভাবতাম আমি। ভেবে এসেছি চিরকাল, যখন পড়েছি, পড়িয়েছি, কাজ করতে ঘুরে বেড়িয়েছি নানা জায়গায়, আর ছোটখাটো পোস্টকার্ডও পাঠিয়েছি তোমাকে, দু'চার লাইন লিখে, সেই সময়টায় আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম, লেখবার মতো কোনও বিষয় না-থাকলে চিঠি নিশ্চিত লেখাই যায় না। আমার মাথা আর হাতকে তখন আটকে রেখেছিল সাহিত্য ও তার বোধ, যাকে আমি জীবনের শেষ কথা বলে মনে করতাম। তাই যখন তুমি ছোট থেকে একটু-একটু করে বড় হয়ে উঠছ, ক্যারোল, এইভাবে একমনে বসে চিঠি কখনওই লেখা হয়ে ওঠেনি তোমাকে। কেবল চিঠির খাতিরে চিঠি লেখবার কথা মনেই হয়নি কখনও।

আজ কিন্তু এমনিই লিখছি তোমাকে। কোনও কারণ নেই তা ছাড়া। এই যেমন বিকেল হয়ে আসছে এখন, এই যেমন কেটল-এ চায়ের জল ফুটছে, একটু পরেই সিটি বাজবে, এই যেমন হাওয়া লেগে উড়ছে জানলার পাশে আটকে রাখা সাদা পরদাটা, এই যেমন আমার ডান পায়ের জুতোর কোনায় লেগে আছে ভেজা মাটি কিছুটা, সেইরকম লিখছি। কেবল লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে বলে। দেখছ তো, না লিখতে-লিখতে হাতের লেখাটার কী দশা হয়েছে আমার? এক সময়ে টানা টাইপরাইটারে লিখেছি, তারপর কি-বোর্ডে। হাতের লেখাটার কথা আর মনেই থাকেনি। সেইজন্যেই কি না কে জানে, আজ হঠাৎ হাতেই লিখতে ইচ্ছে হল আমার। যদি একান্তই বুঝতে না-পারো, কোনও ড্রাগ স্টোরে গিয়ে পড়িয়ে নিয়ো। খারাপ হাতের লেখা পড়ে দিতে ওদের জুড়ি নেই।

জানো, তোমাকে বোধ হয় বলা হয়নি কখনও, একবার আমি আর তোমার মা গিয়েছিলাম সমুদ্রের ধারে। সেবার, কী আশ্চর্য, ছবিও তুলে রাখা হয়নি একখানা। যাই হোক, আমি তখন হার্ভার্ডে কাজ করছি, বস্টনে আমার থাকা। পরে, তুমি যখন খুব ছোট, আমি কিছুদিনের জন্য আবার হার্ভার্ডে ছিলাম, মনে আছে তোমার? আমি যখনকার কথা বলছি, সেটা আমার প্রথমবার হার্ভার্ডে যাওয়া। কাজের বেশ চাপ চলছে, সেইসঙ্গে দুশ্চিন্তাও, কেননা অক্সফোর্ডে তোমার মা একা আছেন পুরোপুরি, আর তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। তোমাকে এক্সপেক্ট করছেন। এমনিতেই তাঁর শরীর ভাল যেত না কখনও, সে-কথা তুমিও জানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সারাক্ষণ তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতাম। অবশ্য ঠিক করেই রেখেছিলাম, ডেলিভারি ডেট-এর আগে-আগে আমি একবার ছুটি নিয়ে অক্সফোর্ড চলে যাব। সে-সময়টায় পাশে থাকা খুব জরুরি।

কিন্তু তোমার মা, ওহ, সেই অভাবনীয় মহিলা করল কী, আমাকে না-জানিয়ে সটান বস্টন এসে উপস্থিত! তখন মায়ের পেটের মধ্যে তুমি দিব্যি বেড়ে উঠেছ, আট মাস চলছে, এর মধ্যে, আমাকে খবর-টবর না-দিয়ে, একদিন সকালে তিনি হাজির হার্ভার্ড চত্বরে। আমি দেখে একটু বকাঝকা করলাম বটে এই বলে যে, সামনেই আমার ছুটি, আমি তো ফিরেই আসছিলাম অক্সফোর্ডে, সে কেন খামোকা এই শরীরে এত দূর আসতে গেল, কিন্তু সত্যি বলি তোমাকে, ভারী আনন্দ হয়েছিল সেদিন তোমার মাকে দেখে।

হ্যাঁ, ততদিনে তোমার নাম রেখে ফেলেছি আমরা, কেবল মুখটা দেখার যা অপেক্ষা। তা তোমার মার ভারী ইচ্ছে, একবার আমাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যান। সত্যি বলতে কী, সেই প্রথম নিজের দেশের বাইরে বেরিয়েছিল সে, নিজের মহাদেশেরও বাইরে বটে। তাই খুব উত্তেজিত ছিল। সে-ই অবশ্য শেষ বেরনো হল তার, সে যাক গে। আমেরিকার প্রকৃতি যে আমাদের ওদিককার চারপাশ থেকে একেবারেই অন্যরকম, সেটা সে জানত বটে, কিন্তু বস্টন শহরে বসে তাকে টের পাওয়া ছিল মুশকিল। তাই তার আবদার, বা বলা ভাল, হুকুমই হল, একদিনের জন্যে হলেও, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেই হবে আমাদের।

তোমার মা'র অভিমানকে আমি জয়েস-এর উপন্যাসের চাইতেও বেশি ভয় পেতাম, সত্যি বলছি। তাই ঠিক হল, একটা গোটা দিনের জন্য আমরা পোর্টল্যান্ড মেইন যাব। বস্টন থেকে মোটরেই যাওয়া যায়, চমৎকার একটা ছোট শহর, এক সময় ব্রিটিশরা এখানে জাঁকিয়ে থাকত বলে, এক লহমায় তার চারপাশ দেখলে মনেই হয় না, মহাদেশটার নাম আমেরিকা। অবশ্য সেই কারণেই গোটা অঞ্চলটাকে নিউ ইংল্যান্ড নাম দেওয়া হয়েছিল। কখনও ছুটি পেলে একবার ঘুরে এসো তুমিও, ভাল লাগবে। তা সে যাই হোক, একখানা মোটর ভাড়া নিয়ে তোমার মা আর আমি বেলাবেলি পৌঁছলাম পোর্টল্যান্ড মেইন, সমুদ্রের ধারে ফুরফুরে সেই বন্দর-শহরে সেদিন চমৎকার গ্রীষ্মের রোদ আর নোনতা-মিঠে হাওয়া। ভারী সুস্বাদু মাছভাজা আর স্থানীয় বিয়ার খেয়েছিলাম সেইদিন, মনে আছে এখনও। তারপর চলে গেলাম শহরের একটু বাইরে, যেখানে জঙ্গল শুরু হচ্ছে, আর সমুদ্রের ধারে, বড় বড় পাথরের গায়ে এসে পড়েছে বিরাট সব মেঘেদের ছায়া। বসার জন্য ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর কী হতে পারে?

জলে নামা মোটেই ঠিক হবে না তার, সেই জন্য আমিও নামব না জলে। কিন্তু সে সাধ করে সুটকেসে বিকিনি নিয়ে এসেছে, জলে না-নামুক, সেটা পরা চাই। মনে আছে আমার এখনও, মেরুনের ওপর হলুদ পোলকা ডটস ছিল। আর কী আকর্ষণীয় যে দেখাচ্ছিল তোমার মাকে বিকিনি পরে! সে যখন একখানা লম্বা পাথরের উপর তোয়ালে পেতে শুয়ে পড়ল, আমার চোখ চলে গেল তার পেটের দিকে, তার কচ্ছপের খোলার মতো বর্তুল, আর উঁচু হয়ে থাকা পেটের দিকে। পাথরের উপর শুয়ে থাকা মানুষটা তখন কেবল আমার কলেজের বান্ধবী নয়, আমার প্রেমিকা নয়, বা আমার আদরের স্ত্রী নয়, সে আমার সন্তানের ভাবী মা। এইটা ভেবেই, ওই সমুদ্রের ধারের দুপুরটা কেমন যেন অলীক মনে হতে লাগল, জানো!

আমি খুব আস্তে-আস্তে, সেই প্রথমবার, তোমার মায়ের পেটের উপর নিজের মাথা রাখলাম, কান ঠেকালাম তার গর্ভের উপরিতলে। সামনেই পাথরের উপর সমুদ্র আছড়ে পড়ার জোরালো আওয়াজ, কিন্তু তাকে ছাপিয়েও আমার ডান দিকের কানে এসে ঢুকতে লাগল তোমার শব্দ। তুমি তোমার সদ্য-তৈরি-হওয়া হাত আর পায়ের অস্তিত্ব জাহির করছ তাদের ছুড়ে-ছুড়ে। আর তোমার মা'র পেটের উপরিভাগে সেই সান্দ্র ধাক্কা এসে আলতো সব ঢেউ তুলছে, আওয়াজ করছে নরম-নরম। যেন আমাদের ছোট্ট ক্যারোল দাবি জানাচ্ছে, আবদার করছে নানারকম। আমি ওই আশ্চর্য দুপুরে, ওই সমুদ্রের ধারে, ওই রোদ-ছায়া আর ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে, তোমার মা'র পেটে কান রেখেই বলতে লাগলাম, "এই যে, ক্যারোল এবার বলছে, আমার কিন্তু লাল সোয়েটার চাই এই শীতেই..." "এই তো, ক্যারোল জানতে চাইছে প্রথম-প্রথম ডিনারে কী-কী থাকবে ওর জন্য..." "আচ্ছা শোনো, ক্যারোল বলছে, ও কিন্তু মোটেই বকুনি বরদাস্ত করবে না আমাদের..." "বুঝতে পারছ? ক্যারোল জানতে চাইছে আমরাও ছোটবেলায় ওর মতো দুষ্টু ছিলাম কি না..." এইভাবে, একের পর এক বাক্য আমি তোমার নামে বলে চলেছি। যেন এক অদ্ভুত খেলা। তোমার মা'র পেটের মধ্যে তোমার এক-একটা করে ঢুঁসো, আর তোমার হয়ে আমার এক-একটা বাক্য। হঠাৎ, আমাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল তোমার মা। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "স্টপ ট্রান্সলেটিং উইলিয়ম। ইউ ক্যান নট ট্রান্সলেট এভরিথিং।"

একটা জাহাজ তখন দূর থেকে আসছে এদিকেই, আর কখন, আমাদের বুঝতে না-দিয়ে, বেশ কিছু সিগাল এসে বসে আছে চারপাশের পাথরের উপরে। সমুদ্রের আওয়াজ জোরালো হচ্ছে আরও, নেমে আসতে থাকা রোদের সঙ্গে তেজ বাড়ছে ঠান্ডা হাওয়ার। আমি চুপ। তোমার মা চুপ। অনেকক্ষণ। সত্যিকারের অনেকক্ষণ। তারপর, সন্ধে নেমে আসার আগে-আগে আমরা ফিরে এলাম জেটির কাছে, মোটরে চেপে রওনা দিলাম, বস্টন ফিরব বলে। ফেরার পথে, একবার, তোমার মা জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে, আমি আর সেই উত্তাপের অনুবাদ করিনি। হয় না বলেই করিনি।

তুমি এখন অনুবাদ করছ, পড়াচ্ছ, আর আমার চেয়ে ঢের ভালভাবেই করছ সেসব। আর আমি এও জানি, তুমি আমার চেয়ে অনেক বিচক্ষণ মানুষ, বেশ কিছুটা তোমার মায়ের মতোই। তাই তোমাকে শেখানোর মতো কিছুই আমার কাছে নেই। এই গল্পটা ছিল, যা হয়তো কোনও-না-কোনও দিন আমি তোমাকে বলতাম। আজই বলে ফেললাম। আমি পারিনি। তোমার মা সেদিন বলার পরেও পারিনি। চারপাশের সমস্ত কিছুকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করে ফেলবার বদভ্যাসটা আমার যায়নি বলতে পার। ইচ্ছে করে করি না হয়তো, নিজে বুঝে ওঠবার আগেই করে ফেলি। ভুল করি। খুব ভুল করি। তুমি করবে না কোনওদিন, জানি।

এই আশ্চর্য গ্রহ আমাদের সুযোগ দিয়েছে নিজের ভাষায় কথা বলবার, চিন্তা করবার, রচনা করবার। আমরা যেন তা করে যেতে পারি। আর বুঝতে পারি, কোথায় থামতে হবে, কখন।

ভাল থেকো। তোমার জন্য এই বুড়োর অনেক চুমো থাকল...

ভালবাসা জেনো,

তোমার বাবা।

চিঠিটা লিখে খেয়াল করলেন উইলিয়ম, ঘড়িতে চারটে বেজে গিয়েছে। আজ শনিবার, চারটে পনেরো থেকে তাঁর অনুবাদের ক্লাস, সেই কাচমোড়া উঁচু গোলঘরে, যেখানে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়, আর যার জানলায় চোখ রাখলে সমুদ্রের ১৮০ ডিগ্রি দেখা পাওয়া যায়। এই হোমের অনেকেই জড়ো হন শনিবার বিকেলে সেই ঘরে, উইলিয়মের কাছে অনুবাদের ক্লাস করতে। সময়ও কাটে ভাল, আর অনুবাদ বিস্মৃতির ক্ষেত্রে প্রায় এক ধরনের চিকিৎসা হিসেবেই কাজ করে। উইলিয়ম নিজে সে-কথা বিশ্বাস না-করলেও, এ নাকি বিজ্ঞানে প্রমাণিত। অবশ্য হাসিমুখ বুড়োবুড়িদের সঙ্গে হপ্তায় একখানা বিকেল-সন্ধে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিতে খারাপ লাগে না উইলিয়মের, বিশেষত তিনি যখন মাঝেমধ্যেই বইপত্র ঘাঁটার ছুতোয় উঁচু এই মিনারঘরটায় চলে আসতে চান, যাতে তিনি আরও দূর পর্যন্ত দেখতে পারেন সামনে বিছিয়ে থাকা, অথচ অস্পৃশ্য সমুদ্রকে।

আজ খুব অবাক হলেন উইলিয়ম, যখন দেখলেন সেই ঘরে ডক্টর বয়েল এসে বসে আছেন সকলের আগে। কিছু একটা শেখবার ইচ্ছে থেকেই এসেছেন নিশ্চিত, ভাবলেন উইলিয়ম, কিন্তু বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ তাঁর চোখেমুখে নেই যে, সেটাও স্পষ্ট। ভারী এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বস্তিকর ব্যস্ততাকে যেন শরীরে কোনওরকমে বন্দি করে বসে আছেন তিনি, যার অনেকটাই উপচে পড়ছে তাঁর অসহায় তাকিয়ে থাকার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে এক অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে বসে আছেন তিনি, উইলিয়মের ক্লাসে।

একে-একে হাজির হলেন সকলেই। সওয়া চারটে বাজতে-না-বাজতে গোলঘরের সবকটা চেয়ার আর সোফা ভরে উঠল অনেক-কিছু-ভুলে-যাওয়া মানুষদের মুখে। তাঁরা গোল হয়ে ঘিরে বসলেন উইলিয়মকে, আর উইলিয়ম, কাচের জানলা প্যানেলের দিকে পিঠ দিয়ে, পিঠের পিছনে সমুদ্রকে রেখে বসলেন। আগের দিন তিনি বলছিলেন, কীভাবে ব্রেশটের নাটককে অনুবাদ করার কথা ভাবা দরকার, কোন পথে তাঁর নাটকের সঠিক অনুবাদের দিকে এগোনো যেতে পারে। প্রত্যেককে কাজ দিয়েছিলেন, একটি করে দৃশ্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে আনার। সকলেই, স্বাভাবিকভাবেই ডক্টর বয়েল ছাড়া, খেয়াল করলেন উইলিয়ম, খাতা বের করে এগিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দিকে।

তাঁর পিছনে, অনেক দূরে, সাদা বালিতে আছড়ে পড়ছে গাঢ় নীল সমুদ্রের ঠান্ডা জল।

ঢেউয়ের মাথায় দুধসাদা ফেনাগুলো জমছে আর ভেঙে বিছিয়ে যাচ্ছে ভেজা বালির গায়ে।

কোনও নৌকা নেই। কোনও জাহাজ নেই। কোনও ট্রলার নেই কোথাও। শুধু দু'-একটি পাখি।

ঢেউয়ের আছড়ে পড়া আর হাওয়ার ছুটে মরা ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই চারপাশে।

দশ মিনিট। আধ ঘণ্টা। এক ঘণ্টা। দু'ঘণ্টা পনেরো মিনিট।

উইলিয়ম দেখছেন তাঁর মাথার পিছন দিকের দৃশ্য।

মাথার সামনের দিকে, খাতা বাড়িয়ে বসে আছেন অনেক-কিছু-ভুলে-যাওয়া মানুষেরা।

কেউ কোনও কথা বলছেন না।

ঢেউ ভাঙছে।

হাওয়া ঘুরছে।

দূরে।

তেরো

"ফোন তুলিস না কেন রে তুই? কাল থেকে কতবার ট্রাই করেছি জানিস?"

পোর্শিয়ার মুখে যে-রাগটা দেখা যাচ্ছে, তার অনেকটাই যে অন্যান্য দিনের মতো বানানো নয়, সেটা দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে সম্যক, কেননা বাদবাকি সময়ে রাগ দেখানোর বেলায় পোর্শিয়ার ঠোঁটের কোণটা ঠিক এমনভাবে অল্প একটুখানি বেঁকে থাকে, যেভাবে একেবারে শেষের কাছাকাছি গিয়ে বাঁক নেয় বুনো মোষের শিং অথবা পাহাড়ি হাইওয়ে, আর সেই বাঁকের আভাস আগে থেকে টের পেয়ে গেলেই এটা দিব্যি বোঝা যায় যে, যতই রাগপত্তর দেখাক না কেন, একটু হেসে কথা বললে সেও হেসে উঠবে, আর তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যদি জড়িয়ে ধরা যায়, তা হলে সে বুকের মধ্যে গুটিয়ে আসবে সেই বুনো মোষের শিং আর পাহাড়ি হাইওয়েকে আরও চওড়া করে নিয়ে। এই অভিজ্ঞতা খুব একটা কম কিছু বার অন্তত হয়নি সম্যকের, গত চার বছরের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে খুব আস্তে-আস্তে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, আর সেই কারণেই আজ, এই একটু আগের ঝমঝমানো বৃষ্টি শেষ হওয়া জুলাই মাসের ভিজে ছপছপ ছাদে বিকেলবেলা দাঁড়িয়ে সে টের পেল, গা ঘেঁষে এই প্রশ্নটা তাকে যে করছে, সেই পোর্শিয়া কোনও হাসি লুকিয়ে রাখেনি ঠোঁটের কোণে। তার রাগটা আসল।

"আমার জ্বর, তোকে তো বলেইছিলাম।"

সম্যকদের ছাদ থেকে বেশ পাড়া-পাড়া ব্যাপারটা দেখা যায় এখনও। চারপাশের একতলা দোতলা বাড়ির ছাদগুলোয় একটু আগের জমে যাওয়া জল টলটল করছে এখনও আর বাড়ির ঝাঁকের ফাঁকে-ফাঁকে বেশ জোলো আর ঠান্ডা হাওয়ার তোড় লেগে এলোমেলো মাথা দোলাচ্ছে নারকেল গাছের দল। একটু দূরে একটা মাঠে ফুটবল খেলছে সেই কখন থেকে ছেলেরা, কাদা মেখে ভূত একজন একটা পেনাল্টি কিক নিল সম্যকের মুখে 'জ্বর' কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সময়ে, কিন্তু 'বলেইছিলাম' কথাটা বলাকালীন সেটা বারে লেগে ফিরে এল।

"জ্বর বলে ফোন ধরবি না? এটা কোনও কথা হল সম্যক? তুই তো আইসিইউ-তে ভর্তি নেই? তা ছাড়া মিশকা, বনি, শর্মী, সঙ্কলের সঙ্গে তোর এই দু'দিনে ফোন আর এসএমএস-এ কথা হয়েছে, আমি খবর পেয়েছি। তা হলে এটা বল যে, আমার ফোন ধরবি না ঠিক করেছিস। কিন্তু কেন, সেটা তো আমি জানতে পারি, না কি?"

"সেটা জানতেই হঠাৎ আমাদের বাড়ি ছুটে এলি? পড়া নেই তোর আজকে?"

"বাজে কথা বলিস না প্লিজ়। হ্যাঁ, সেটা জানতে এলাম তো বটেই। কিন্তু না হলে বুঝি কখনও আসি না? গত হপ্তায় আসতে পারিনি, কয়েকটা জরুরি ডকুমেন্ট রেডি করার ব্যাপারে আটকে ছিলাম, সিরিয়াসলি, দম ফেলার সময় পাইনি। কিন্তু এত রাগ দেখাচ্ছিস কেন? কী হয়েছেটা কী?"

পোর্শিয়ার গলার চড়া রোদটা একটু পড়ে এসেছে, দেখতে পাচ্ছে সম্যক, যেভাবে ঘণ্টাদুয়েক আগে গোটা কলকাতার সমস্ত ছাদগুলোর উপরে দপ করে নিভে এসেছিল রোদ, আর তার কিছুক্ষণ পর চারপাশ অন্ধকার করে টানা দেড় ঘণ্টার ঝমঝমে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল সবক'টা ছাদ, সেইরকম। সেইরকম নিভে আসছে পোর্শিয়ার গলার রোদ, দেখতে পাচ্ছে সম্যক, যখন কথাটা শেষ করে মোলায়েম একটা ঢোঁক গিলছে পোর্শিয়া আর তার উজ্জ্বল বাদামি কণ্ঠা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে আবার পড়ে যাচ্ছে, যেন এই মুহূর্তে বলা বাক্যের পিঠে একটা স্পিডব্রেকার ছিল, যা সে আগে থাকতে আন্দাজ করে উঠতে পারেনি কিছুতেই।

"আমার জ্বরের চেয়ে তোর ডকুমেন্ট গোছানোটা জরুরি ছিল পোর্শিয়া? তা হলে আজও ডকুমেন্ট গোছালেই পারতিস, খামোকা এলি কেন?"

"ডোন্ট বিহেভ লাইক আ কিড, সম্যক। অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট? সত্যিই আজও ডকুমেন্ট গোছাতে পারলে সুবিধে হত আমার। কিন্তু ছুটে এলাম, আসতে হল, কেননা তোর এই হঠাৎ অফ হয়ে যাওয়াটা আমাকে ইরিটেট করছে। রাদার কষ্ট দিচ্ছে। সেটা বুঝিস কি তুই?"

পোর্শিয়া নিজের এক কুচি উড়তে থাকা অবাধ্য চুলের গুচ্ছ গোছাল ঝটপট, এটা তার সারাক্ষণের স্বভাব। আজ মেঘলা হাওয়ায় চুলগুলো বেশি অবাধ্যতা করে ফেলছে আর পোর্শিয়াও শান্ত নেই বিশেষ, তাই এই আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আটবার সে চুলের গুচ্ছটাকে কোনওরকমে মাথার পিছনদিকের ঝুঁটিতে গোঁজার চেষ্টা করেছে এবং প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। সম্যকের চেয়ে লম্বায় আধ ফুট খাটো পোর্শিয়ার ঝকঝকে চোখ দুটো সরু, আরশোলা রঙের ফ্রেমের নীচে ফ্লিকার করছে বারবার, যেরকম ফিলামেন্ট কেটে যাওয়ার আগে পুরনো বালবগুলো করতে থাকে। এমনিতে ভারী ছিমছাম রোগাসোগা চেহারার পোর্শিয়া প্রায় সারাক্ষণ হালকা সুতির টপ আর লং স্কার্ট পরতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নইলে ভারী আরামদায়ক সব শাড়ি। যে পরছে, তারও আরাম, যে দেখছে, তারও। পাতলা আর বাদামি ঠোঁটে মাঝেমধ্যে আঠালো আর চকচকে পোশাক পরাতে দেখলেও, লিপস্টিক খুব একটা ব্যবহার করতে তাকে অন্তত দেখেনি সম্যক, আর সেসব ছাড়াই পোর্শিয়ার ঠোঁট দুটোর রং আর স্বাদ তার এত এতবার ভাল লেগেছে যে, মাঝেমধ্যে লিপস্টিক পরতে দেখলেই আক্ষেপ হয়েছে। কিন্তু যা সে অন্য কোনও বন্ধুর মধ্যে আর কখনও দেখেইনি পোর্শিয়ার মতো, তা হল মেধা। যখনই তাকে নিজের পড়াশোনার বিষয়ে কিছু বুঝিয়েছে পোর্শিয়া, সম্যক হয়তো তার বেশির ভাগটাই অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে মাত্র, বুঝতে বিশেষ পারেনি, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট বুঝেছে যে, এমন মেধাবী পড়ুয়া তাদের পাঁচ ব্যাচ আগে-পরে কলেজে আর আসেনি। মেধাসম্পন্ন মানুষ অবশ্য সম্যক যে খুব কম দেখেছে একেবারে তাও নয়, কিন্তু যা প্রায় সত্যিই দেখেনি সে পোর্শিয়ার আগে, তা হল কেবল নম্বর পাবার জন্য বা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তাক লাগানোর জন্য নয়, নিজের বিষয়টাকে ভালবেসে সেই বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য স্বপ্ন দেখা আর এগিয়ে যাওয়ার সাহস। যেটা সে পোর্শিয়ার মধ্যে বারবার দেখেছে এবং বারবার, একটু-একটু করে, আরও একখানা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে তার দিকে। আজ অবশ্য সেই সিঁড়িগুলোই তাকে বা বলা ভাল তাদের পৌঁছে দিয়েছে এই মনমরা বিকেলের ছাদে এবং নিজের ভেতরকার অস্বস্তির কারণটা, খুব অবচেতনে হলেও, অবাক করে দিচ্ছে সম্যককে। কেননা, আজ যা অস্বস্তির, গত মাস পর্যন্ত, ঠিক সেই কারণেই পোর্শিয়াকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসে এসেছে সে। আজও বাসছে, কিন্তু রাগ হচ্ছে তার ভারী।

একটা ঝামেলার পাখি ডাকছে কোথাও, ডেকেই যাচ্ছে, কাছেপিঠের কোনও একটা নারকেল গাছের মাথা থেকে। রোজই ডাকে হয়তো এই সময়ে, কিন্তু আজ তার ডাকটা অসহ্য লাগছে, বিশেষ করে সম্যক যখন জানে যে এই মেঘলা আর স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা বিকেলটা আর-একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে, যখন সামনের মাঠটায় বাচ্চারা আর খেলবে না এবং দূরের কোনও একটা বাড়ির আধখোলা জানলা থেকে গলা সাধার একটা বেসুরো আওয়াজ ভেসে আসবে এদিকে, পাশাপাশি পুরো খোলা জানলাগুলোয় একই সঙ্গে জ্বলে উঠবে আলো ও সিরিয়ালের সংলাপ। আজ সন্ধেটা বিশেষ মনভাল দিয়ে শেষ যে হবে না, এখন থেকেই তা বেশ আন্দাজ করতে পারছে সম্যক, কেননা তার এইবার, হয়তো অকারণ, তবুও মেজাজ খারাপ করতে ইচ্ছে করছে আস্তে আস্তে। সেটাকে যতটা সম্ভব আড়াল করবার চেষ্টা নিয়ে সম্যক বলল, "তা হলে বলেই ফেললি তো সত্যিটা? আমার খোঁজ নিতে আসার চেয়ে ডকুমেন্ট গোছানোটা তোর কাছে বেশি জরুরি ছিল? এলি কেন তা হলে পোর্শিয়া? এই কথাটা শোনাতে?"

"চার বছরের সম্পর্কের পর প্রত্যেকটা মুভ যদি ট্রান্সলেট করে বুঝিয়ে দিতে হয় সম্যক, তা হলে তো খুব মুশকিল। বিকজ় আই অ্যাম নট আ গুড ট্রান্সলেটর অ্যাট অল। আগে তো আমরা বুঝতাম রে, হ্যাঁ? বুঝতাম না, বল? আমি চুপ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও তুই বুঝতিস কী হয়েছে, কেন আমার মনখারাপ, বা তুই দিনের পর দিন পাগলামো করতে থাকলেও আমি তোকে শান্ত করে দিতে পারতাম। তা হলে হঠাৎ কোথায় অসুবিধে হচ্ছে, একটু বলবি প্লিজ় আমাকে?"

"তুই বাইরে চলে যাচ্ছিস?"

"মানে? এটা কি নতুন কথা নাকি? তুই তো জানিস সম্যক, জানিস না? ইন ফ্যাক্ট বাবা মাকে বলবার আগে আমি তোকে এসে বলেছি যে, এমআইটি-তে একটা ভাল রিসার্চ ওপেনিং পেয়েছি, ডোন্ট ইউ রিমেম্বার? আমরা সেদিন মুভি দেখতে গিয়েছিলাম। তুই এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে যাচ্ছিস? হঠাৎ জিজ্ঞেসই-বা করছিস কেন?"

"ওহ, তা হলে এখন জিজ্ঞেসও করতে পারি না?"

"বাংলা সিনেমার মতো করে কথা বলিস না, খুব বাজে শোনায়। জানা জিনিস জিজ্ঞেস করছিস বলেই অবাক লাগছে। সেদিন আমরা ফেরার পথে অনেকখানি হেঁটেছিলাম। তোকে বলেছিলাম ওরা কী ভাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফার করছে। এও বললাম যে, এমআইটি-তে ওপেনিং পাওয়া আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কতটা ইমপর্ট্যান্ট। আপাতত পাঁচ বছরের রিসার্চ পিরিয়ড, তারপর কাজ বুঝে এক্সটেনশন। তুই সবটা শুনেছিলি সম্যক।"

"এগজ্যাক্টলি মাই পয়েন্ট পোর্শিয়া, আমি সবটা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম শুধু। কিছু বলেছিলাম কি?"

"বুঝলাম না। কোথাও কি কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়েছিল সেদিন?"

"কমিউনিকেশন কাকে বলে পোর্শিয়া? তোর বলে দেওয়াটাকেই যদি তুই কমিউনিকেশন ভাবিস, ইরেস্পেক্টিভ অফ মাই ওপিনিয়ন, তা হলে সেটা কমিউনিকেশন হয়তো, কিন্তু আমার কাছে সলিলোকি।"

"শোন সম্যক, কী বলতে চাস সেটা স্পষ্ট করে বল। ডোন্ট শো মি ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ স্কিল।"

"তা হলে শোন। তুই সেদিন একবারও জিজ্ঞেস করিসনি আমি কী চাই। তুই শুধু নিজের পাওয়া অফার, নিজের ভবিষ্যৎ প্ল্যান আর নিজের ডিসিশনটা আমাকে শুনিয়েছিলি। তুই ডিসিশন নিয়েই আমাকে বলতে এসেছিলি, তাই তো? তা হলে আমার মতামতের কোনওই দাম নেই তোর কাছে? তুই তোর জীবনটা তোর মতো করে প্ল্যান করে নিতে পারিস। ইন ফ্যাক্ট, নিয়েওছিস। তা হলে আর এসব কেন? আমার জ্বর হয়েছে, খোঁজ নিতে এসেছিস, ভাল লাগল।"

"ওহ, এই কথা!"

"হ্যাঁ, এটাই কথা। কেন, শুনতে খারাপ লাগছে খুব?"

"সম্যক, আমি কিন্তু ঝগড়া করতে আসিনি রে, একটা খারাপ সন্ধে কাটাতে আসিনি তোদের বাড়ি।"

"আমি ঝগড়া করছি না তো, চা খাবি?"

"আমি ভেবেছিলাম, আমি অফারটা পাওয়ায় তুই খুশি হয়েছিস। যেরকম আমার বাবা আর মা হয়েছেন, কাছের বন্ধুরা হয়েছে, তুইও হয়েছিস। বাট আই ওয়জ় রং।"

"খুশি হয়েছি, কিন্তু তুই কমিট করার আগে একবার জিজ্ঞেস করলি না পর্যন্ত? আমার কি এটুকুও জায়গা নেই তোর জীবনে?"

"তোর জায়গা অনেকখানি, অন্তত আমি তো তাই ভাবি রে। আর সেই কারণেই জিজ্ঞেস করিনি, যেমন আমার বাবা-মাকেও করিনি। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এটা বোঝার যে, আমার কাজের পক্ষে কোন অফারটা ভাল, কোনটা নয়। অ্যান্ড দিস অফার ইজ় ব্লাডি ব্রিলিয়ান্ট! বরং এটা ছেড়ে দিলেই তো আমার কাছের মানুষদের দুঃখ পাবার কথা, তাই না? আর যদি তুই বলিস, ইটস অল অ্যাবাউট আস্কিং, মানে, ঘুরিয়ে যাকে পারমিশন নেওয়া বলে, তা হলে আমি স্যরি। আমার কাজের জায়গায় আমার সমস্ত ডিসিশন আমি চিরকাল একা নিয়েছি, পরেও একাই নেব। সেটা নিয়ে গ্রাম্বল করবি, তোকে কখনও এতটা পিছিয়ে থাকা মানুষ মনে হয়নি।"

পাখিটা চুপ করেছে। কিন্তু নারকেল গাছগুলো হাওয়ায় দুলে শনশন আওয়াজ করছে। দূরের মাঠের ছেলেগুলো বল হারিয়েছে একটা কর্নার কিক নিতে গিয়ে একটু আগে। হারমোনিয়াম বেজে উঠল। আশাবরী। আঁখিয়া লাগি রহত নিসদিন।

"তা কি আমি একবারও বলেছি পোর্শিয়া?"

"বলিসনি, কিন্তু তোকে তো আমি চার বছর চিনি, তোর পারমিশন নিইনি কেন, সেটাই ঘুরিয়ে বলতে চাইছিস। আর আমি ভাবছিলাম, এরকম একটা অফার পেয়েছি, তুই কত খুশি হবি।"

"খুশি হইনি, এ কথা একবারও বলছি না।"

"খুশি হলে বলতে হয় না রে, বোঝা যায়।"

"আমি জাস্ট বলছি যে, হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার রিলেশনশিপ? তুই নিজেই বলেছিলি পাঁচ বছরের রিসার্চ ওয়র্ক, মাঝে খুব বেশি হলে দু'বার আসতে পারবি দেশে, কী করে থাকব আমরা? পাঁচ বছর দূরে-দূরে থাকা, সহজ এত?"

"দুটো জিনিস ভুলে যাচ্ছিস তুই সম্যক। এক, আমি তোর চেয়ে সাড়ে তিন বছরের বড়। সুতরাং আমার কেরিয়ার বা কাজ, সবই তোর আগে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে দৌড়চ্ছে। তোর হাতে যে-সময়টা আছে, আমার হাতে তার চেয়ে কম আছে। দুই, যে-সুযোগটা পেয়েছি, সেটা সচরাচর আসে না। এটাকে কাজে লাগাতে পারলে আমি যা-যা ভেবেছি, তার অনেকটাই হয়তো করতে পারব। সেটা আমার কাছে বিরাট ব্যাপার রে। সম্পর্ক তো তার জায়গায় তার মতো করে থাকবে। আমি তো দূরে যাচ্ছি শুধু, চলে তো যাচ্ছি না। কিন্তু কাজের এতবড় একটা সুযোগ ছেড়ে দিলে সারা জীবন আক্ষেপ করতে হবে, আর সেটা আমি পারব না। রাদার, করব না।"

"ইউ আর বিইং সেলফিশ পোর্শিয়া।"

"নো সম্যক, অ্যাম জাস্ট ফোকাসড। দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক।"

"তা হলে তোর কাছে সম্পর্কের চেয়ে, আমাদের সম্পর্কের চেয়ে কাজ অনেক বেশি জরুরি, তাই তো?"

"যদি এভাবে দেখিস ব্যাপারটাকে, তা হলে বলার কিছু নেই সম্যক। কিন্তু একটা কথা তুই আজ না-বুঝলেও কোনওদিন হয়তো বুঝবি, কাজও আসলে একটা সম্পর্ক। কাজও আসলে এক ধরনের ভালবাসা, নির্ভরতা, বন্ধুত্ব। কাজও আসলে কোনও মানুষের চেয়ে কম কিছু দাবি করে না। আমি তোকে যতটা ভালবাসি, নিজের কাজকে তার চেয়ে কম ভালবাসতে পারব না, এটুকুই বলার। আজ চলি। সামনের সপ্তাহে মঙ্গলবার ফ্লাইট, সন্ধেবেলা। তার আগে দেখা হবে নিশ্চয়ই..."

এই অবধি বলে, টিমটিম করে জ্বলতে থাকা পাড়ার আলোগুলোয় মিইয়ে আসা আর প্রায়ান্ধকার ভেজা ছাদে, পাঁচিলের ধার ঘেঁষে সম্যকের মুখটা দু'হাতে ধরে তার ঠোঁটের দিকে ঠোঁট নিয়ে এসেছিল পোর্শিয়া, অথচ খুব চেনা তার শ্বাসের ঘ্রাণ নাকে এসে পৌঁছতেই নিজের মুখ এক ঝটকায় সরিয়ে নিল সম্যক। তার চোখ বন্ধ তখন।

"ওহ, স্যরি। আসি রে। শুধু এটুকু বলব, নিজের সামনে কোনওদিন কাজের বড় দরজা খোলা দেখতে পেলে মুখ ঘুরিয়ে নিস না। মনে রাখিস, শুধু তোরই কাজকে নয়, কাজেরও তোকে দরকার। একদিন তুই বুঝবি নিশ্চয়ই। জাস্ট ওপেন ইওর আইজ, সম্যক..."

সম্যক চোখ খুলল না। সম্যক চোখ বন্ধ করে শুনতে লাগল একটা দ্রুত শ্বাসের ওঠাপড়ার শব্দ যা দূরে মিলিয়ে যেতে-যেতে কখন মিশে গেল সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাওয়া পায়ের আওয়াজে আর তারপর হারিয়ে গেল ফের হঠাৎ নেমে আসা ঝমঝম বৃষ্টির ধারালো শব্দের ঝাঁকে, যে-বৃষ্টি আসবে বলে দু'মিনিট আগেও বোঝা যায়নি।

সম্যক দাঁড়িয়ে থাকল।

সম্যক চোখ না-খুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

সম্যক চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল ঠায়।

বৃষ্টি পড়ে যেতে থাকল, পড়েই যেতে থাকল।

তারপর কখন বৃষ্টির ধারালো সেই শব্দ বদলে গেল বহু মানুষের করতালির গরম আওয়াজে।

আর সম্যক শুনতে পেল, কে যেন তার কানের কাছে মুখ এনে বলছে, "জাস্ট ওপেন ইওর আইজ় সম্যক..."

সম্যক চোখ খুলে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে হে ফেস্টিভ্যালের সেন্টার স্টেজে, চড়া আলোর নীচে, তাঁবু ভর্তি উন্মুখ শ্রোতা-দর্শকদের সামনে, যখন তার পাশেই দাঁড়িয়ে কানে মুখ রেখে তাকে চোখ খুলে তাকাতে বলছে ক্যারোল, আর একটু দূরে, পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে এমিলি বলছেন, "অ্যান্ড উই আর প্রাউড টু প্রেজেন্ট সম্যক ঘোষাল অল দ্য ওয়ে ফ্রম ইন্ডিয়া..."

বৃষ্টি ধরে আসছে।

চোদ্দো

আগুন জ্বলছে কাঠের গায়ে। কাঠের শরীর জড়িয়ে শিফনের শাড়ির মতো আলুথালু হয়ে জ্বলছে প্রিয় আগুন আর তার কড়মড় চটাপট শব্দ এসে বিঁধছে ভারী নরমভাবেই কানে, যখন তার নীলচে-কমলা শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা উজ্জ্বল সোনালি রঙের ছোট-ছোট স্ফুলিঙ্গজোনাকি ঘূর্ণিময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ঠান্ডা বাতাসের এপিঠে-ওপিঠে। গোল-গোল কাঠের টুকরোর গা থেকে উঠে আসছে লকলকে আর নাছোড় আগুন, যার লালচে-সোনালি আভায় কাছে-দূরে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে চারপাশের সমস্ত কিছু, এমনকী মানুষের মুখও।

এই ঘাসজমিতেই, কিছুটা দূরে, নিভে আছে একের পর এক টাঙিয়ে রাখা টানটান সফেদ শামিয়ানার দল, যারা আজ সন্ধে পর্যন্তও জমজমাট আলোর উৎসব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এইখানে। আটটা নাগাদ এই বছরের মতো সমাপ্তি ঘোষণা করেছে হে ফেস্টিভাল। আর সাতদিনের এই সাহিত্য উৎসব তার সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর বহু-বহু শ্রোতা-দর্শক হোটেলে গিয়ে তাঁদের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছেন, বহু লেখক রওনা হয়ে যাচ্ছেন স্টেশনের পথে, বহু বই-বিক্রেতা শিপিং-এর ব্যবস্থা করছেন নিজেদের ঠিকানায়। নিভে এসেছে তাই সবটাই। তাঁবুগুলোও, পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা শামিয়ানারাও এখন দেখতে হয়ে উঠেছে ধূসর সব ছোটখাটো পাহাড়ের মতোই, যাদের গায়ে গায়ে এই কয়েক ঘণ্টা আগেও বুনো পোকার আলোর মতো লেগে ছিল লণ্ঠনেরা। সেসব লণ্ঠন অবশ্য আজ অন্তত মাঠে মারা যায়নি, বরং তাদের খুলে এনে, কাঠের খুঁটির সঙ্গে তার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অগোছালো জমায়েতের চারপাশে, ঝলমলে আগুনের সহকারী হিসেবে। তাই আগুনের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষজনের মুখে, হাতে, ট্রাউজ়ার্সে বা খোঁপায় যেটুকু অতিরিক্ত নীলচে-কমলা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন, তার দায়িত্ব ওই লণ্ঠনদেরই একরকম।

সম্যক যদিও সকাল থেকে ভারী উদ্বেগে ছিল নিজেদের সেশনটা নিয়ে, কিন্তু কখন যে দীর্ঘ সেই অনুষ্ঠান দ্রুত পেরিয়ে গেল, সে বুঝেই উঠতে পারত না, যদি-না পুনরায় করতালির আওয়াজ পার করে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েই এমিলি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠতেন, "ইউ ওয়্যার অ্যাবসোলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট সম্যক!" কথাটা অবশ্য সেশন শেষ হওয়ার পর অনেকের মুখ থেকেই শুনেছে সে, কিন্তু বারবার তাকিয়ে থেকেছে ক্যারোলের মুখের দিকে, যে সেশন শেষ হবার পর, অথর্স লাউঞ্জের আর-এক কোনায় কফির কাপ হাতে আরও দু'-তিনজনের সঙ্গে হাসি-আড্ডায় মশগুল। অনেককে কাটিয়ে, সকলের হাসির উত্তরে একটাই হাসি টাঙিয়ে রেখে সে কোনওমতে এগিয়ে গিয়েছে ক্যারোলের দিকে, সেই পড়ে আসা রোদ্দুরের বিকেলবেলায় যখন সেলোফেনের স্বচ্ছ পরদা ভেদ করে ঠান্ডা রোদ এসে পড়ছে অথর্স লাউঞ্জের কার্পেটের শরীরে। এগিয়ে গিয়েছে আর কফির কাপ টেবল-এ রেখে তাকে কষে জাপটে জড়িয়ে ধরেছে ক্যারোল। সম্যক কিছু বোঝার আগেই তার বুক ঢাকা পড়ে গিয়েছে ক্যারোলের নরম উষ্ণ সোয়েটার মোড়া বুক দিয়ে, তার পিঠে কাটাকুটি খেলছে ক্যারোলের খুশি-খুশি দুটো হাত, আর তার একদিকের কানে বারবার ঘষা খাচ্ছে ক্যারোলের চুলগুলো, যখন ক্যারোল ফিসফিস করে তার কানে-কানে বলে উঠছে, "তুমি আমাকে চমকে দিয়েছ!"

সেই জড়িয়ে ধরাটা এখনও, এই বেশ ঠান্ডা হাওয়া চলতে থাকা পাহাড়তলির ঘাসজমিতে, শরীরে লেপটে আছে সম্যকের, যখন সকলে খোশমেজাজে এই জমায়েতের আয়োজন করেছে, কেননা বিচ্ছেদের আগে একখানা উদ্‌যাপন ভারী জরুরি। গিটার জোগাড় হয়েছে দু'খানা, এক সোনালি খোলা চুলের, লাল সোয়েটার আর কালো স্কার্ট পরা যুবতী বাজাচ্ছে তার একটাকে, আর-একখানায় সুর খেলাচ্ছে ব্লেজ়ার পরা ঝলমলে পনিটেল-যুবক। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে 'উই উইল রক ইউ' গাইছে বেশ কয়েকজন, বাকিরা হাতে-হাতে তালি দিয়ে গমগমে করে তুলছে রাতের এই চড়ুইভাতি, হাত থেকে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে চলকে উঠতে থাকা লাল ও সোনালি পানপাত্র সব, আর একদিকে কাঠকয়লার উনুনে সেঁকা হচ্ছে ভেড়ার মাংস, যার পোড়া গন্ধের সঙ্গে ওয়াইন আর ক্লান্তির ঘামের গন্ধ মিশে এই রাতের প্রান্তর এক আশ্চর্য আদিমতায় পরিণত হতে চাইছে।

অল্প ভিজে থাকা ঘাসের ওপর বসে, আগুনের গনগনে আঁচে, কিছু দূরে হাসিমুখে গান শুনে ঘাড় হেলাতে থাকা ক্যারোলের দিকে একদৃষ্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ওয়াইনের সাত নম্বর গ্লাস শেষ করে ঘাসের ওপর এলিয়ে রেখে দিচ্ছে সম্যক, যখন কিছুতেই তার নজর সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে না আশ্চর্য এই মেয়েটির মুখের আলো থেকে, যে একটু আগে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল নিজের মধ্যে টেনে নেবার জন্য।

এক দফা মাংসের স্তর কেটে কেটে নামানো হল, আর ন্যাপকিনের গায়ে শুইয়ে রেখে ধোঁয়া উঠতে থাকা সেসব লালচে-কালো নরম হয়ে আসা তুলতুলে টুকরোদের বিলি করা হল হাতে-হাতে, সঙ্গে ধরা হল নতুন গান। একদল অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে অক্লান্তভাবে গেয়ে চলেছে আর পান করে চলেছে ওয়াইন, সঙ্গে সেই রূপকথার জুটির মতো রাজকন্যে আর রাজপুত্তুর বাজিয়ে চলেছে টানটান গিটার, আর বাকিদের মিঠে নরম হাততালি তো আছেই।

নতুন গান, 'হোটেল ক্যালিফোর্নিয়া'। যে-গান শুরু হবার সময়েও সম্যক জানে না, সোজাসুজি তার দিকে তাকাবে ক্যারোল, তাকিয়ে থাকবে গানের প্রথম স্তবকটা শেষদিকে পৌঁছনো পর্যন্ত আর তারপর হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে হেঁটে আসবে তার দিকে, সম্যকও উঠে দাঁড়াবে, আর তখনই তার হাত ধরে, কানের কাছে মুখ রেখে গরম একটা গলায় বলে উঠবে ক্যারোল, "শ্যাল উই ডান্স?"

বাকিটা সম্যকের আগে দেখা নয়। কেননা, তার ভাবনার আগেই এবং অজান্তেই তার হাত, ডান হাত আস্তে-আস্তে গিয়ে মাপে মাপে বসে গেল ক্যারোলের কোমরের নরম আর ঢেউখেলানো বাঁকে, ঠিক যেখান থেকে তার পেট বয়ে চলেছে উরুর দিকে, সেই ঢেউয়ের মাথায় নেমে এল সম্যকের হাতের পাতা, এমনভাবে, যেন বহুদিন আগে ঠিক এই বাঁকের মাপেই বুনে দেওয়া হয়েছিল তার করতল, যাতে তা এতদিন পর ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় নেমে এসে জুড়ে যেতে পারে কোনও দ্বিধা ছাড়াই। আর-এক হাত আঙুল দিয়ে জাপটে ধরল ক্যারোলের এক হাত, আঙুলে আঙুলে জাফরি কাটা শেষ হওয়ামাত্র, নাচের এক ঘূর্ণনেই তারা চলে যেতে পারল আবছা এক ঘষা কাচের ওপারে।

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

প্রথমবার ঘুরতেই তারা দেখল, এক অজানা শস্যের বিস্তৃত খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা, আর তাদেরকে মাঝখানে রেখেই চারপাশের হাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে দুলছে ঘন বেগুনি রঙের ফুরফুরে অথচ ভারী শস্যরাজি। গোল ঢাকনার মতো মাথার উপরকার আকাশ যা কমলা আর সোনালিতে মিশে আছে এমনভাবে, যেন এখনই তার নীচে গ্লাস রাখলে সে আলোর রস ঢেলে দেবে গ্লাস পূর্ণ করে। ঘন বেগুনি শস্যের খেত। আর অনেকখানি দূরে, শস্যের অনেক গাঢ় সারি পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা বৃহৎদেহী ট্র্যাক্টর, যার রং মরচে-লাল, আর যার গায়ে এই আশ্চর্য রোদ পড়ে ঝলসে উঠছে বারবার। হাওয়া কোনদিক থেকে আসছে বোঝা মুশকিল, কিন্তু স্কুলপড়ুয়াদের মতো এক নামতা-বাধ্যতার দুলুনিতে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পরিপক্ক এই শস্যরাজিকে।

তারা পরের ঘূর্ণনে ঢুকল এবার।

So I called up the Captain,
'Please bring me my wine'
He said, 'we haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine'
And still those voices are calling from far away,
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face.

এবারকার ঘূর্ণন থামতেই তারা দেখল, তারা দাঁড়িয়ে আছে এক বরফাচ্ছাদিত পর্বতচূড়ায়, যার চারপাশ কেবল মিইয়ে আসা সাদা ঢেউয়ের সমাহার। রোদ আছে, কিন্তু যেন নেই। জ্যোৎস্না আছে, কিন্তু যেন নেই। অন্ধকারও আছে, কিন্তু যেন নেই। যেন চব্বিশ ঘণ্টার বাইরের কোনও সময়। মিহি অথচ পুরু বরফের আস্তরণ বাচ্চা ছেলের গায়ে চড়ানো মোলায়েম লেপের মতোই এই শৃঙ্গ থেকে ওই শৃঙ্গে বিস্তৃত, যেভাবে বাচ্চাটির মাথা থেকে নেমে এসে আবার হাঁটুর কাছে উঁচু হয়ে ওঠে লেপ, সেভাবে। হাওয়া একপাশ থেকে এসে তাদের উপর দিয়ে অন্য পাশে বয়ে যেতে সময় লাগছে অনেক অনেকক্ষণ। তাই শীত করছে না। শীতের অত সময় নেই, দাঁড়াবার মতো। কোনও গাছ বা গুল্ম নেই, কোনও পশু বা পাখি নেই কোথাও। দূরের পাহাড়ে, একটা হিমবাহ, থমকে আছে। আসলে সে নামছে, নেমে আসছে, নেমে যেতে থাকছে, ধীরে ধীরে, একবার পলক ফেলবার সময়টুকু ধরে।

তারা এবার প্রবেশ করল তার পরের ঘূর্ণনে।

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said, 'we are all just prisoners here, of our own device'
And in the master's chambers,
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives,
But they just can't kill the beast

নিথর হয়ে যাওয়া এক শহর, ধুলো উড়ছে। বালির আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে পিচের রাস্তা, টানটান হাইওয়ে আর উড়ালপুলের কাটাকুটি। ধুলো উড়ছে। ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে কোনও এক চওড়া রাস্তার মাঝখানে, যার দু'পাশে, সামনে, পিছনে যত দূর দেখা যায়, স্কাইস্ক্র্যাপারের ঝাঁক। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে পার্ক করা গাড়ির দল, কিন্তু তাদের চোখমুখ ঢেকে গিয়েছে বহু যুগের ধুলোয়। বহুতলের নীচে, ফুটপাথের পাশে অগুনতি দোকানের সারি, যার আর কোনও খদ্দের নেই, ব্যবসা নেই, খোলা বা বন্ধ নেই। তারা নিথর। ধুলো উড়ছে তাদের শরীর চেঁছে দিতে চিতে। এই ধুলোর বাতাসের মধ্যে, নিথর হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া শহরের মাঝখানে, রক্তাল্পতায় ভুগতে-ভুগতে এক সময় শুকিয়ে যাওয়া শিরার মতোই সাদাটে রাজপথের মাঝবরাবর দাঁড়িয়ে আছে তারা, কোমরে, কাঁধে, হাতে, আর সমস্ত সত্তায় নিজেদের স্পর্শ নিয়ে। ধুলো উড়ছে। তারা আরও একটু কাছাকাছি চলে আসছে পরস্পরের। ধুলো, তাদের মধ্য দিয়ে যেতে পারছে না কিছুতেই।

এখান থেকে পরের ঘূর্ণনে ঢুকে পড়ল দু'জন।

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
'Relax' said the night man,
'We are programmed to receive.
You can check out any time you like,
But you can never leave!'

ঝিঁঝির ডাক আর দূরে কোনও এক বয়ে যাওয়া জল ছাড়া ঘন এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরণ্যের রাত্রে এখন আর কোথাও কোনও শব্দ নেই, যদি-না মাইল-মাইল বিছিয়ে থাকা স্তব্ধতাকেও শব্দের মধ্যে ধরা হয়। এক গাছ থেকে আর-এক গাছের ফাঁকে মাত্র একজনের মতো মানুষ দাঁড়াতে পারে বলেই বোধ হয় কাছে আসতে-আসতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে ওরা দু'জনেই, ওদের শরীরের অগ্রভাগ মিশে গিয়েছে এমন আশ্চর্যভাবে যেন মাঝে কোনও সেলাইয়ের দাগ নেই কোথাও, যখন ওরা পরস্পরের চোখের মধ্যে থেকে চোখ না-সরিয়েও বেশ বুঝতে পারছে যে, রাত্রিকালীন এই ঘন অরণ্যের বৃক্ষরাজির গায়ে-গায়ে জমে আছে ফ্লুরোসেন্ট সবুজ রঙের মস ও শ্যাওলা, যাদের দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে জোনাকিদের জমায়েত আর এইসব গাছ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে এত দ্রুততায় যে, বোঝার আগেই তাদের পাতারা মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যের দিকে, নইলে দেখা যেত, পাতাদের রং উজ্জ্বল সবুজ থেকে নীলের দিকে চলে যাওয়ার মাঝপথে আটকে আছে এখন। মাটি থেকে পা ঢেকে দিয়ে তাদের কোমর অবধি উঠে এসেছে প্রাচীন সব গুল্ম, যাদের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই হয়তো, তালে-তালে দুলে উঠছে। এখানে ভয় স্নেহের মতো দেখতে, এখানে সাহস দেখতে আদরের মতোই।

হঠাৎ কাচ ভাঙার ঠুনকো আওয়াজে চারপাশের সেই অরণ্য, তার গুল্ম আর ফ্লুরোসেন্ট সবুজ ঝুরঝুর করে গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ছে মুহূর্তের মধ্যে আর সম্যক খেয়াল করছে, নাচতে গিয়ে, ক্যারোলকে বুকের মধ্যে চেপে জড়িয়ে ধরে নাচতে গিয়ে তার পা পড়ে গিয়েছে তারই শুইয়ে রাখা কাচের পানপাত্রের উপরে, আর সেই আওয়াজে শেষ হচ্ছে গানও, যখন তুমুল আরও এক দফা সমাপিকা করতালির মধ্যে আড়াল নিয়ে মুখের দিকে মুখ ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে তারা দু'জন, আর ক্যারোলের ভারী অথচ টানটান চোখের দিকে সোজা চোখ রেখে সম্যক, খুব আস্তে, নিভে আসা গলায় প্রশ্ন করছে,

"কাল তুমি ফিরে যাবে? সত্যিই?"

পনেরো

"আলোটা একবার জ্বালালে ভাল হত না, বলো?"

"একেবারেই না, এক্কেবারেই না। আলো এইরকমই থাকবে এখন। বুঝলে মশায়?"

"কিন্তু আমার পড়তে ভারী অসুবিধে হচ্ছে যে..."

"হওয়ারই তো কথা, এই আলো তো পড়বার জন্য নয়।"

বেশ চওড়া একখানা শোবার ঘরের মোমদানিতে একখানা মাত্র মোম জ্বলায়, পড়তে সত্যিই বেশ অসুবিধে হচ্ছে ডক্টর বয়েলের। সন্ধে থেকে, যখন থেকে তাঁদের এই কোয়ার্টারের চারপাশের আলো নিভে আসতে শুরু করেছে, তিনি বিছানায় উঠে মুখের সামনে খুলে ধরে রেখেছেন একখানা বেশ মোটা আকারের অভিধান, ইংরেজি থেকে ইংরেজিতে যার যাতায়াত এবং যে-বইটা তিনি তুলে এনেছেন আগের শনিবার, উইলিয়ম ব্রাইটের ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর, ওই মিনারের ওপরকার গোল কাচঘরের লাইব্রেরি থেকে। 'সেডেটিভ' শব্দটার একখানা ইংরেজি প্রতিশব্দ সেই বিকেল থেকেই খুঁজে চলেছেন তিনি, সঙ্গে অবশ্য আরও বেশ কিছু শব্দের প্রতিশব্দ খোঁজা জারি রেখেছেন, কিন্তু কোনওটারই মনোমতো উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। অভিধান বলছে তার মতো করে, লেখা আছে সেখানে সমস্ত শব্দেরই প্রতিশব্দ, কিন্তু ডক্টর বয়েলের মনঃপূত হচ্ছে না কোনও এক কারণে। কোথায় একটা খচখচানি, একটা অস্বস্তি, একটা অসম্পূর্ণতার বোধ বারবার ফিরে এসে ধাক্কা মারছে তাঁর মাথায়।

আজ রাউন্ড থেকে ফিরে এসে বাইরের জামাকাপড়ও বদল করেননি ডক্টর বয়েল, যা নাকি তাঁর প্রত্যেক দিনকার বাঁধা অভ্যাস। বাড়ি ফেরা, ঝরঝরে একটি স্নান, তারপর এক পেয়ালা চা এবং বাড়িতে বানানো কেক বা ওই জাতীয় কিছুর জন্য অপেক্ষা করা, যখন বাগান থেকে ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী রোলি তাঁকে সেসব পরিবেশন করবেন। দিনের এই একটা সময়ে তাঁর এবং রোলির কথা হওয়ার চমৎকার পরিসর, এবং একটা সময় পর্যন্ত তা হতও। কিন্তু মাসকয়েক যাবৎ যে-কোনও সংলাপ এত অবধারিত ভাবে কলহের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে যে, একরকম চুপচাপই থাকতে পছন্দ করেন ডক্টর বয়েল। বাগবিতণ্ডায় তাঁর চিরকালের অনীহা, বা বলা ভাল, স্পষ্টতই ভয়। তাই আজও তিনি কাজ থেকে এসে কথা না-বাড়িয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। রোলি এই সময়টায় তাঁদের বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে, বর বাড়ি ফেরার কিছু পরে সেও বাড়ির সামনের ছোট্ট একচিলতে বাহারি বাগান গুছিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে।

সেভাবে দেখতে গেলে, রোলি এবং ডক্টর বয়েলের বাসস্থান ও তার চারপাশ বেশ ঈর্ষণীয়। এ-বাড়ির ডান হাতে একটু দূর গিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে এই হোমের এলাকা, কিন্তু তারপরেও অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গাছপালা, আর আস্তে-আস্তে উঁচুর দিকে উঠে যাওয়া ঘাসজমি, যা বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে একসময়ে খাড়াই টিলায় পরিণত হচ্ছে, যাকে এখানকার লোকজন ক্রিক বলে ডাকেন এবং যার নীচে, সটান খাড়াই বেয়ে নীচে তাকালে দেখা যায়, বাদামি পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে আইরিশ বে-র ঢেউ।

বাঁ হাতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হোমের অঞ্চল ও বসতি। সোজা কথায় বলতে গেলে, বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে তাকালে বেশ কিছুটা রাস্তার পর দেখা যায় একের পর এক কটেজ, যেখানে মার্থা বা উইলিয়ম ব্রাইটরা থাকেন, তার ওপাশে দেখা যায় হেঁশেলে নেমে যাওয়ার রাস্তা, এবং একপাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেই সাদা ধবধবে মিনারটিকে, যার ওপরকার কাচঘরে আগের দিন বিকেলে ক্লাস করতে গিয়েছিলেন ডক্টর বয়েল। সত্যি বলতে কী, তাঁদের কটেজখানা ভারী নিরিবিলি ও শান্তিপূর্ণ। যদি-না অবশ্য শান্তি তাঁদের বাড়ির মধ্যেই বিঘ্নিত হয়।

আজ, শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার ভয়েই হয়তো একরকম, ডক্টর বয়েল চড়ে বসেছেন ধপধপে সাদা, নরম আর উঁচু বিছানায়, মুখে অভিধান গুঁজে। বাগান সেরে বাড়িতে ঢুকে এই দৃশ্যে বেশ কিছুটা অবাক হলেও, কী আশ্চর্য, রোলি তেমন কিছু বলেনি, বরং ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কিচেনে। ডক্টর বয়েল যে দেখছেন অভিধান, তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-একবার বই সরিয়ে টুক করে দেখে নিচ্ছেন কিচেনের দিকে, বউ আসছে কি না তা বোঝার জন্য। এমনভাবে আজ তিনি ডুবে থাকবেন বইয়ের মধ্যে যে, লন্ডনে যাওয়ার কথা আর তুলতেই পারবে না রোলি, এমনটাই তাঁর ধারণা, বা বলা ভাল, চেষ্টা। পড়ছিলেন যখন তিনি, কাচের জানলা দিয়ে ঢুকে আসা দিনের আলো বেশ ভালই ছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল অভিধানের ছোট-ছোট অক্ষরগুলো। ইতিমধ্যে গরম-গরম মাংসের পাই এবং রেড ওয়াইন তিনি পেয়ে গিয়েছেন এবং সত্যিই উপভোগ করেছেন। তা ছাড়া অবাক কাণ্ড এই যে, এসব দিয়ে যাওয়ার সময় রোলি তেমন কোনও বাক্যব্যয় করেনি। আর সেইখানেই আরও বেশি করে আশঙ্কা ডক্টর বয়েলের, কেননা এই তুমুল চুপ থাকা আসলে কিছু পরের বিধ্বংসী ঝড়ের পূর্বাভাসও হতে পারে, আগের বহু অভিজ্ঞতায় যা হয়েছে।

আলোটা, যেমন বুঝতে পারছেন ডক্টর বয়েল, পড়ার পক্ষে ঠিক জুতসই নেই আর। সাধারণত এই সময়েই প্রত্যেক কটেজে আলোগুলো জ্বলে ওঠে। সেইরকম একখানা বড় ল্যাম্প জ্বেলে নেওয়ার যখন ভারী দরকার বলেই মনে করলেন ডক্টর বয়েল, বাধা দিল রোলি।

"হওয়ারই তো কথা। এই আলো তো পড়বার জন্য নয়," এই কথাটা যখন বলছেন রোলি, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর, মনে হচ্ছে যেন, বেশ দূর থেকে ভেসে আসছে এবং কিছুতেই, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোনও বিরোধ বা কলহ চাইছে না। তা হলে ঠিক কী চাইছে রোলির এই পাতলা, মিহি, ফিসফিসে কণ্ঠস্বর? তাকিয়ে, খেয়াল করলেন ডক্টর বয়েল, রোজকার এই সময়ে দেখতে পাওয়া রোলি আর আজকের রোলির মধ্যে তফাতখানা। রোজ এই সময়ে রোলি যখন ঢুকে আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে, বাগানের কাজ-কারবার করার কারণেই তার হাতে আর পোশাকে, সাদা অ্যাপ্রনে লেগে থাকে মাটি, আর জামাকাপড় থাকে বেশ ভাঁজ খাওয়া, ধুলোমাখা। কিন্তু আজ সেটা হয়নি।

চোখ তুলে আর নামাতে পারলেন না ডক্টর বয়েল, কেননা রোলিকে দেখে আজ একেবারেই অন্যরকম লাগছে। অন্যান্য দিনের মতো রোলির পোশাকের কোথাও কোনও ধুলো বা মাটির লেশমাত্র নেই, একটা ভাঁজ নেই তার জামাকাপড়ের কোনও অংশে। কেননা আজ, এই মুহূর্তে, রোলির শরীরে কোনও পোশাক নেই। সম্পূর্ণ সুতোহীন অবস্থায় রোলি স্থিরভাবে দাঁড়ানো, বিছানার ঠিক অপর প্রান্তে, ডক্টর বয়েলের পায়ের দিকে, তাঁর চোখে সটান তাকিয়ে। কেন রোলির কণ্ঠস্বর আজ অন্যরকম শোনাচ্ছে, এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল ডক্টর বয়েলের কাছে। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত কাটতে, পেরোতে, অনেকখানি সময় লাগল যেন তাঁর।

উত্তরে কিছু বলতে পারলেন না তিনি, বরং মুখের কাছে ধরা অভিধান, বা বলা ভাল তাঁর বর্মখানা স্বয়ংক্রিয় ভাবে তাঁর ভারী দুই হাতসহ নেমে এল তাঁর উঠতে আর নামতে থাকা, আসলে হাঁপাতে থাকা বুকের কাছে, যখন তিনি এত-এত দিন পর সোজা, চোখ টানটান করে তাকালেন রোলির শরীরের দিকে, যাকে তখন একটু-একটু করে সেঁকছে কাচের ওপার থেকে অস্ত-যেতে-থাকা সূর্য। সেইসঙ্গে অবশ্য বেডসাইড টেবল-এ জ্বেলে রাখা লম্বা, পুরু আর সাদাটে মোমের শিখাও নিজের প্রতিফলন দপদপ করে দোলাচ্ছে রোলির গলা আর ঘাড়ের কাছটায়। দম, শিহরনে, বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ডক্টর বয়েলের, কেননা তিনি এই দৃশ্যের আকস্মিকতায় যা প্রথম বোধ করছেন, তা হল হাঁপ।

"অনেকদিন পর দেখছ আমায়, তাই না? কেমন দেখাচ্ছে, সত্যি করে বলো তো?"

নিজের খুলে রাখা চুলে একবার খুব পরিকল্পিত ইতস্তত আঙুল চালিয়ে দিয়ে হিসহিসে গলায় বলে উঠল রোলি, যেমনভাবে সে কখনও কথা বলে না। তার কণ্ঠস্বর, পাতলা, নিচু আর হিলহিল করে দুলতে থাকা সরু কণ্ঠস্বর কিছুতেই তার নিজের বলে বিশ্বাস হত না, যদি-না ডক্টর বয়েল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বউকে কথাগুলো বলতে শুনতেন, বা বলা ভাল, দেখতেন। রোলি, বিছানার ওই প্রান্তে দাঁড়িয়ে অল্প-অল্প দুলছে, নাকি তাঁর নিজের মাথাই একটু-একটু এপাশ-ওপাশ করতে শুরু করেছে, ঠিক ঠাহর হচ্ছে না ডক্টর বয়েলের। কিন্তু রোলিকে তিনি নিজের সামনে, খুব আস্তে-আস্তে, মাদক মাখানো ধানের শিষের মতোই দুলতে দেখছেন, যখন দুই বর্তুল আর পরিপূর্ণ অ্যালার্ম ঘড়ির মতোই এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক দোল খাচ্ছে রোলির ফরসা ও উন্মুখ দুই স্তন। এই দুই যমজ বোন, পিঠোপিঠি গায়ে গা লাগিয়ে টানটান হয়ে থাকা এই দুই স্তনকে শেষ কবে দেখেছেন, মনে করতে পারলেন না ডক্টর বয়েল, কিন্তু এ-কথা বুঝলেন, তাঁর মনে করার শক্তি, হাত নাড়ানোর শক্তি, কথা বলবার শক্তি, সব একসঙ্গে দুলতে-দুলতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, ওই দুই দোলায়মান সম্মোহনপুঞ্জের ইশারায়।

"তাকাও, এদিকে তাকাও, বলো, কী দেখছ তুমি..."

রোলির এই কণ্ঠস্বরের বিনিময়ে কোনও রকমে, শরীর ও মগজের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে ডক্টর বয়েল নিজের ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করছেন রোলির দুই বাদামি বৃন্তে, অ্যালার্ম ঘড়ির চূড়ায় অবস্থিত পিনের দিকে, যা টিপে দিলে অ্যালার্ম ঘড়ির অস্থিরতা বন্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে। কতদিন, কত-কত দিন রোলির দুই বৃন্তে ঠোঁট ঠেকাননি ডক্টর বয়েল? শুনতে চাইছেন তিনি, আর বুঝতে পারছেন, ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাওয়া দুই স্তন তাদের হিংস্র দুই বৃন্ত নিয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর মুখের দিকে, এতদিনকার প্রতিশোধ উসুল করে নিতে।

"এসো, আমার কাছে এসো, আমাকে নাও, পুরোপুরি নাও আজ আবার..."

বলতে-বলতে বিছানায় উঠে আসছে রোলি, হামাগুড়ি দিয়ে, দুই হাঁটু আর হাতের দুই চেটোর উপর ভর দিয়ে, সামনের দিকে ঝুঁকে, হরিণের অসতর্ক মুহূর্তে হাজির হওয়া চিতার মতো আস্তে-আস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে সে। আকাশ থেকে গহ্বরের দিকে মুখ নামিয়ে পাশাপাশি দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে দু'জন অ্যালার্ম ঘড়ি, যাদের বৃন্তদ্বয়ে জমাট বেঁধে অপেক্ষা করছে সময়, কারও শুষে নেবার জন্য।

ডক্টর বয়েল বুঝতে পারছেন, তাঁর দুই চোখের পাতা এতটাই ভারী হয়ে এসেছে যে তাদের টানটান করবার জন্য ক্রেন প্রয়োজন হতে পারে, গতমাসে হাইওয়ে সারানোর জন্য যেমন হলুদ রঙের ক্রেন দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ধারে। কিন্তু আর বিশেষ কিছু বোঝার আগে আরও অনেকটাই কাছে চলে এল গোলাপি সূর্যের চাকা চাকা দাগ গায়ে-ধরা চিতা। অবশ্য গোলাপি এখন অনেকটাই লাল হয়ে এসেছে এবং আর কয়েক মিনিটের মধ্যে বেডসাইড টেবল-এ জ্বলতে থাকা লম্বা, পুরু, সাদাটে মোমবাতিই হয়ে উঠবে আলোর একমাত্র উৎস, কিন্তু এই সমস্ত রকম নিভে আসার মধ্যেও ধকধক করে জ্বলছে চিতার দুই চোখ, যা রাতে বই পড়বার সময়ে রিমলেস একখানা চশমা ব্যবহার করে রোজ।

"তুমি কেন চাও না, আমি লন্ডন চলে যাই, উম? তুমি কি আমাকে মিস করবে খুব তখন? মনে পড়বে আমার কথা? বলো না... আজ কিন্তু ঘুমোতে দেব না তোমাকে, বুঝছ তো?"

হিসহিসে গলায় কথাগুলো বলে এক ঝটকায় ডক্টর বয়েলের বর্ম থাবার মোলায়েম আঘাতে সরিয়ে দিল রোলি, আর অভিধান তার সমস্ত শব্দ নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল মেঝেতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন এ-কথার উত্তর দেওয়া হচ্ছে একরকম, এমনভাবে ধড়মড় করে রোলিকে কিছুটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডক্টর বয়েল বলে উঠছেন, "তা হলে বলো, সেডেটিভ-এর প্রতিশব্দ কী?"

রোলি ঝুঁকে থাকা শরীরটাকে এক পাশে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট? কী বলছ তুমি?"

তার গলায় তখন আর সেই ফিসফিসে আদুরে ভাবটা নেই একেবারেই।

ডক্টর বয়েল কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালেন, এই ঝাপসা ভাবটা তাঁকে কাটাতেই হবে, যেভাবেই হোক না কেন। রোলি তাঁর বুক থেমে নেমে বিছানার একপাশে টানটান হয়ে বসে আছে তখন, সটান তাকিয়ে আছে ডক্টর বয়েলের দিকে আর ঠান্ডা অথচ গরম গলায় কাটা-কাটা স্বরে বলছে, "তুমি এখন কোথাও যাবে না, যাবে না কোথাও।"

বলছে, এবং বুঝতে পারছে, তার সম্মোহন আর কাজ করছে না, কেননা ডক্টর বয়েল ততক্ষণে 'সেডেটিভ' শব্দটা বারকয়েক বলতে-বলতে শার্টের বোতাম আটকাতে-আটকাতে পায়ে জুতো গলাতে-গলাতে কোনওরকমে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ছেন সন্ধের অন্ধকারে, ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে।

রোলি বিছানা থেকে নেমে এল ওই অবস্থাতেই, খুব ধীর পায়ে হেঁটে বেডসাইড টেবল-এর কাছে পৌঁছল। চুপ করে দাঁড়াল মোমটার সামনে। তারপর মরচে-পড়া ধাতুর শ্বাসে জোর শব্দে একটা ফুঁ দিল। নিভে যাওয়া ছাড়া মোমের আর উপায় থাকল না কোনও। জানলার বাইরে অন্য আলো নেই তখন, নইলে দেখা যেত, সাদা, লম্বা, আর পুরু মোমবাতিটাকে থাবায় নিয়ে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলছে রোলি, আর ঘরের মধ্যেকার অন্ধকারে জ্বলে উঠছে তার চোখ। একবার।

ষোলো

বুড়ো বন্ধু আমার,

তোমার কোনও কথাই যে ফেলে দেবার মতো নয়, তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝেই গিয়েছ এতদিনে, আর দ্যাখো, তোমার দেখাদেখি, বরাবরের মতো তোমাকে নকল করতে গিয়ে, এই এতদিন পর হাতে চিঠি লিখছি আমিও, যদিও আমার হাতের লেখা কোনও দিনই ভাল ছিল না এবং সেই জন্য তোমার কাছে বিস্তর বকুনিও খেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে ফেস্টিভালে এই নিয়ে তো কমবার আসা হল না, এবারও সেই একই রকমের মুগ্ধতা কাজ করল। তোমার করে-যাওয়া সেশনগুলোর কথা এখনও এখানে বলেন অনেকে। সত্যি বলতে কী, তোমাকে আরও একবার এখানে নিয়ে আসার জন্য ওঁরা যে কী পরিমাণ আগ্রহী, আমি বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু লন্ডনের অসময়ের বৃষ্টির মতোই তাঁদের সে-আশায় জল ঢালতে হয়েছে আমাকে। যদিও তাঁরা পুরোপুরি হাল ছেড়েছেন বলে মনে হল না আমার।

এখানে লেবার পার্টি জেতার সম্ভাবনা অনেকখানি, তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই। আমি কেবল ভাবছিলাম, সেই আগেকার তুমি হলে কতখানি খুশিই না হতে। অথচ আমি নিশ্চিত, তুমি টেলিভিশন চালিয়ে এ বছর খবরটুকুও শুনছ না। একদিক থেকে অবশ্য ভালই করেছ, জানো। এই যে সমস্ত কিছু থেকে সরে আসতে পারা, এ তো একরকম অর্জনই, তাই না, বলো? বিস্মৃতি বলে বটে লোকজন, আমার কেবল মনে হয়, নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য। হয়তো তুমি স্বীকার করবে না সে-কথা, কিন্তু আমার মনে হয় সেইরকম। আর মনে হয়, বেশ তো। সারা জীবনের অর্জনের পর কেউ যদি নিঃস্পৃহ হয়ে কাটাতে চান তাঁর বার্ধক্য, তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? আর সেই নিঃস্পৃহতার শরীরে যদি চাপিয়ে রাখতে পারা যায় বিস্মৃতির নিখুঁত পোশাক, তবে তো চমৎকার! বুড়ো বন্ধু, আর কেউ না চিনুক, আমি তোমাকে ভালই চিনেছি।

তোমার আর মায়ের গল্পটা পড়ে আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম ডর্মের ঘরে, জানো, মায়ের কথা মনে পড়ছিল বড্ড। যদিও খুব, খুবই আবছা মনে আছে তাঁর স্পর্শের কথা আমার, তবুও। তুমি যে বলছিলে, চোখের সামনে যা দেখি, সমস্ত কিছুকে অনুবাদ করে ফেলাটা ঠিক নয়, সে-কথা বিশ্বাস করি আমিও। বিশ্বাস করি, অনুবাদ আসলে এক ধরনের শৃঙ্খলা, চেন দিয়ে তৈরি একটা ব্রিজ, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় শব্দ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এক সময়ের পর সেই চেন, সেই শৃঙ্খল ভাষার গলায় চেপে বসতে থাকে, তখন ব্রিজ দিয়ে পারাপারের মজাটা, ভ্রমণটা চলে যায়। তোমাকে এসব বলছি কেন, জানি না, এ অভিজ্ঞতা আমার বহু আগে তোমার নিজেরই তো হয়েছে।

তার চেয়ে, আমিও তোমাকে গল্প বলি একখানা, যা এর আগে তোমাকে বলা হয়নি। তা হলে বরং বেশ একটা শোধবোধ হবে আমাদের, তাই না? গত বছরের আগের বছর সিডনি রাইটার্স ফেস্টিভালে এক টার্কিশ নাট্যকারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার চেয়ে বড় হবে কিছুটা বয়সে, একবার দেখেই প্রেমে পড়ে যাবার মতো সুপুরুষ, তোমায় আমি মিথ্যে বলব না। আর নাটক সে নেহাত মন্দ লেখে না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার, ভাষা ছাড়াও, বিরাট একটা তফাত আছে, প্রথম আলাপেই সেটা খেয়াল করলাম। ছেলেটি দেখতে পায় না। পেত আগে, আট বছর বয়স পর্যন্ত পেত, তারপর এক দুর্ঘটনায় তার দু'চোখের দৃষ্টি পুরোপুরিভাবে চলে যায়। নতুনভাবে ব্রেল শিখতে হয় তাকে, নতুনভাবে বাঁচা শিখতে হয়। কলেজ থেকে সে সিরিয়াসলি নাটক লেখা শুরু করে এবং এখন, বুঝতেই পারছ, নামডাক হয়েছে কিঞ্চিৎ।

তার সঙ্গে এক সন্ধেবেলা এমনি বসেই যখন গল্প করছি, আর, আবারও, মিথ্যে বলব না তোমাকে, আমার বুড়ো বন্ধু, যখন আমরা দু'জন বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি, হঠাৎ তাকে খুব ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করে বসলাম। বললাম, "আচ্ছা, এই যে আট বছর দেখার পর আর দেখতে পেলে না কিছু, অথচ এখন পৃথিবীর নানা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আক্ষেপ হয় নিশ্চয়ই খুব?" এই প্রশ্নের উত্তরে, সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, জানো। তারপর এমন একখানা কথা বলল, যা আমি কোনওদিন কারও কাছ থেকে শুনব বলে আশা করিনি। সেই যুবক আমাকে বলল, "আক্ষেপ হয় বই কী। খুব বেশিরকম আক্ষেপ হয়। কিন্তু আমার এত বছরের অন্ধত্বের জন্য নয়। ওই প্রথম আট বছরের দেখতে পাওয়ার জন্য আক্ষেপ হয়। ওই আট বছরের দৃষ্টি আমাকে প্রতিবন্ধী করে দিয়েছে, সারা জীবনের জন্য। পূর্ণ অন্ধত্বের যে-স্বাধীনতা, তা থেকে আমি চিরকাল বঞ্চিত থেকে যাব। আমার এক জন্মান্ধ বন্ধু আছে, সেও লেখে। কবিতা লেখে সে। তার লেখা সে আমাকে শোনায়, আর আমি তাকে ঈর্ষা করি এই ভেবে যে, তার কল্পনাশক্তির দশ ভাগের এক ভাগও যদি থাকত আমার, কত ভাল সব নাটকই না লিখতে পারতাম আমি। গত ৪০ বছর ধরে আমার কোনও দৃষ্টি নেই। কিন্তু একবারের জন্য হলেও, সেই যে আমি জেনে গিয়েছি কোনটা সবুজ আর কোনটা নীল, কাকে বলে সাইকেল আর হিমবাহ কিসের নাম, তাইতেই আমার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। হাত-পা বাঁধা হয়ে গিয়েছে চিরতরে। আমার সেই জন্মান্ধ বন্ধু যখন তার কবিতায় 'আলো' শব্দটা ব্যবহার করে, আমি তার সেই কল্পনার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারি না, তার সেই ধারণার আন্দাজ করে উঠতে পারি না। এর চেয়ে বড় আক্ষেপ আর কী থাকতে পারে বলো? ওর মতো জন্মেই অন্ধ হয়ে গেলে আজ আমার সামনে কল্পনার একখানা নতুন দিগন্ত খোলা থাকত। অথচ আমি একটুর জন্য সেটা হারালাম।"

এর পর আমি আর ছেলেটির সঙ্গে কথাই বলে উঠতে পারিনি, হয়তো বিস্ময়ে, হয়তো-বা লজ্জায়, ঠিক জানি না। কিন্তু এইটুকু বুঝেছিলাম, আমাদের কতখানি সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। অনুবাদের কাজ। চাইলেও আমরা ওই চেন লাগানো ব্রিজটার বাইরে যেতে পারি না, সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা। যদিও আমি স্থির বিশ্বাসী, এর বাইরে কোনও চওড়া, খোলা রাস্তা আছে নিশ্চয়ই, যার খোঁজ এখনও কেউ পায়নি। তবে পেলে যে আমার বুড়ো বন্ধু বাবা-ই সেটা পেতে পারে, সে-বিষয়ে আমি আরও নিশ্চিত।

বেশ রাত হল এদিকে, কাল সকালে চিঠিটা ক্যুরিয়ার করব তোমায়। ঘুমোও এখন।

অনেক ভালবাসা,

তোমার ছোট্ট মেয়ে, ক্যারোল

সামান্য হেসে, চিঠিটা ভারী যত্নে ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরতে-পুরতে একইসঙ্গে দুটো আওয়াজ শুনতে পেলেন উইলিয়ম। এক, প্রবল জোরে মেঘ ডেকে উঠছে, যার মানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাল রকম ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হবে, আর দুই, দরজায় কেউ একজন টোকা দিচ্ছে। অফিসার সকালেই এসেছিলেন, সন্ধেবেলা তাঁর শহরে কাজ থাকে, সুতরাং তিনি তো নন। মার্থা এই কিছু আগেই চা উপভোগ করে আর আড্ডা দিয়ে নিজের কটেজে ফিরে গিয়েছে, অতএব সেও নয়। তা হলে কে হতে পারে, এটা ভাবতে-ভাবতে দরজা খুলেই দেখলেন, ডক্টর বয়েল দাঁড়িয়ে আছেন। ডক্টর সাধারণত সকালের দিকেই রাউন্ডে আসেন, সন্ধের পর তাঁকে একমাত্র ডিনার ছাড়া আর কোথাও দেখেছেন বলে উইলিয়মের মনে পড়ল না। তা ছাড়া এও মনে পড়ল না, এমন এলোমেলো আর আলুথালু পোশাকে, এমন উসকোখুসকো চুলে এবং এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি চোখে তাঁকে তিনি এর আগে দেখেছেন কি না। স্পষ্টতই, দেখেননি।

উইলিয়মের নিজের কিছু কাজ ছিল এই সময়টায়, বিশেষত ভাবছিলেন, মেয়েকে চিঠির একখানা উত্তর লিখবেন, তাই ফাঁকা সময়টা বরবাদ করার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে ঠান্ডা হাওয়ায় কোনও শীতপোশাক ছাড়া একটু-একটু কাঁপতে থাকা ডক্টর বয়েলের চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে সামান্য সন্দেহ হল উইলিয়মের। আর যা-ই হোক, তাঁর দৃষ্টি স্বাভাবিক নয় কোনওভাবেই।

"ডক্টর বয়েল? আপনি? এই সময়ে? সব ঠিক আছে তো?"

"আমি যারপরনাই দুঃখিত প্রফেসর ব্রাইট, এই অসময়ে আপনাকে... আসলে একটা শব্দ..."

"আসুন, আগে ভিতরে আসুন আপনি। বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই বেশি।"

যেন কেউ তাড়া করেছে, এমন একখানা সন্দিহান, সন্ত্রস্ত চাহনি নিয়ে, আড়চোখে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে, একখানা অস্বস্তিকর সৌজন্যের ব্যর্থ হাসি মুখে টাঙিয়ে উইলিয়ম ব্রাইটের চওড়া সান্ধ্য ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকে পড়লেন ডক্টর বয়েল, আর ঘরের দরজা বন্ধ করামাত্র, যেমন বলেছিলেন উইলিয়ম, হঠাৎই বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে।

ফাঁকা চেয়ারের দিকে ইশারা করা সত্ত্বেও কিছুতেই বসতে চাইলেন না ডক্টর বয়েল, বরং কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, "আচ্ছা, সেডেটিভ-এর প্রতিশব্দ কী?"

ডক্টর বয়েলের এই অসময়ে এহেন কৌতূহল উইলিয়মের কাছে খুব যে স্বাভাবিক ঠেকল, এমন নয় এবং তিনি এ-ও বুঝতে পারলেন, উত্তর দেওয়া ছাড়া এখন কোনও গতিও নেই।

"সেডেটিভ-এর প্রতিশব্দ পাওয়া তো খুব কঠিন কাজ নয় ডক্টর বয়েল, ঘুমের ওষুধ বলতে পারেন।"

ঠান্ডা গলায়, সরাসরি ডক্টর বয়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাবটা দিলেন উইলিয়ম। আর দেওয়ামাত্র বুঝলেন, ডক্টর বয়েল আরও অস্থির হয়ে উঠছেন।

"না না, এ তো আমি জানি। তা নয়, সেডেটিভ-এর প্রতিশব্দ ঘুমের ওষুধ... এরকম নয়।"

"মানে? সেডেটিভ-এর প্রতিশব্দ ঘুমের ওষুধ নয়?"

"তা নয়। আপনি বুঝতে পারছেন না প্রফেসর ব্রাইট, একটা অস্বস্তি... একটা ঝামেলা... মানে, সেডেটিভ-এর প্রতিশব্দ আপনার কাছে নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধ নয়? নিশ্চয়ই গাছ, বা বাতাস, বা বরফ, বা সংগীত, এইরকম কিছু একটা? বা আরও অন্যরকম কিছু? সেইটা! আমার সেইটা চাই! বলুন, প্লিজ়..."

উইলিয়মের চোয়াল আপনা থেকেই শক্ত হয়ে এল, যেভাবে ট্রেন থামার পর স্বাভাবিকভাবেই কাছাকাছি এসে আটকে যেতে চায় বিচ্ছিন্ন দু'খানা বগি, যেন এতক্ষণের গতিই ছিল তাদের বিচ্ছেদের কারণ। ডক্টর বয়েলের চোখের মধ্যে অস্থিরতার সেই গতি অবশ্য কমে এসেছে এখন, বদলে এক আশ্চর্য ভয়, এক অসহায়তার রং ফুটে উঠেছে সেখানে, খেয়াল করলেন উইলিয়ম ব্রাইট। আর শক্ত করলেন নিজের ঠান্ডা স্বর, যা বাইরের বৃষ্টিতে আছড়ে পড়া হাওয়ার চেয়ে কিছু কম শীতল নয়।

"আপনি ভুল ভাবছেন ডক্টর বয়েল। সেডেটিভ-এর একমাত্র প্রতিশব্দ এইটিই।"

"আপনাকে আমি ঠিক... মানে আপনি কেন এরকম করছেন বলুন তো... আচ্ছা, সেডেটিভ বাদ দিন। চলুন, সেই খেলাটা খেলি, সেই যে, আমি একটা শব্দ বলব আর আপনি তার..."

"ডক্টর বয়েল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার অন্যরকম সহায়তা দরকার। তা ছাড়া এটা ঠিক সেই খেলাটা খেলার উপযুক্ত সময় নয়, তাই না?"

"আহ, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন প্রফেসর ব্রাইট, আমাকে খেলতেই হবে। একবার! অন্তত একবার খেলুন, প্লিজ়..."

হাতজোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে আর চিনতে পারছেন না উইলিয়ম ব্রাইট। কিন্তু বুঝতে পারছেন, কীভাবে খেলতে হবে খেলাটা।

"বেশ, বলুন।"

প্রতিপক্ষের মতোই যেন ডক্টর বয়েলের মুখোমুখি দাঁড়ালেন উইলিয়ম ব্রাইট।

"বিস্মৃতি?"

"ওবলিভিয়ন।"

"তিক্ততা?"

"তেতো বা কটুস্বাদ।"

"লাল?"

"রক্তিম।"

"বিপ্লব?"

"বিদ্রোহ বা মিউটিনি।"

"ঝুড়ি?"

"বাকেট বা বেতের বাক্স।"

"অরণ্য?"

"জঙ্গল।"

"উফ, না! আপনি কেন ভুলভাল জবাব দিচ্ছেন প্রফেসর উইলিয়ম? আপনি কি আমার কষ্টটা... আপনি ঝুড়ির মানে বলেছিলেন মহাকাশ, আর অরণ্যের মানে... অরণ্যের মানে... অপেক্ষা... ইয়েস! আমার মনে আছে!"

"কিন্তু আমার তো মনে নেই ডক্টর বয়েল..."

"কীভাবে? কীভাবে এত সহজে ভুলে যেতে পারেন আপনি?"

"আপনি তো জানেন ডক্টর বয়েল, সহজে ভুলে যাওয়াটাই আমার রোগ। জানেন না?"

এইবারে ডক্টর বয়েলের মুখের অভিব্যক্তি অসহায়তা থেকে রাগে বদলে গেল মুহূর্তে আর আশ্চর্যভাবে এই প্রথমবার, গলা বেশ চড়িয়েই তিনি উইলিয়মের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "এই সমস্ত ষড়যন্ত্র, জানি আমি। কিচ্ছু ভোলেননি আপনি, কিচ্ছু না! আপনি এরকম করতে পারেন না প্রফেসর ব্রাইট, পারেন না এরকম করতে! আপনাকে বলতেই হবে, ঝুড়ি মানে মহাকাশ! বলুন আপনি!"

উইলিয়ম ব্রাইট কোনও উত্তর না-দিয়ে সটান তাকিয়ে থাকলেন ডক্টর বয়েলের দু'চোখের দিকে, যে-তাকানোয় সহিষ্ণু করুণা ছাড়া আর কোনও অনুভূতি নেই। আর তা বুঝতে পেরেই হয়তো, গাল লাল হয়ে যাওয়া বেঁটেখাটো রাগী মানুষটা, যিনি এক সেকেন্ড আগেও আঙুল তুলে শাসাচ্ছিলেন উইলিয়মকে, ভেঙে পড়লেন কান্নায়। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উইলিয়মের ঘরের কার্পেটে বসে পড়ে ডক্টর বয়েল মিনতি করলেন ভেজা গলায়, "আমাকে সারিয়ে দিন প্রফেসর, সারিয়ে দিন আমাকে... একবার, অন্তত একবার বলুন, অরণ্য মানে অপেক্ষা..."

উইলিয়ম ব্রাইটের ভারী মায়া হল খুব স্বাভাবিক কারণেই। তিনি নরম গলায় বললেন, "ডক্টর বয়েল, এই মুহূর্তে আগে আপনার প্রয়োজন এক পাত্র ওয়াইন।"

এইটা বলামাত্রই, আশাতীতভাবে এক ঝটকায় চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর বয়েল, তারপর বললেন, "আপনি বলেছিলেন সমুদ্রের প্রতিশব্দ অভিধান, তাই না? ভুল জানেন আপনি। সম্পূর্ণ ভুল। আমার কাছে শুনে নিন। সমুদ্রের একটাই প্রতিশব্দ। একটাই। কবর... কবর... কবর..."

বলতে-বলতে, আটকানোর কোনও সুযোগ না-দিয়ে, দরজা খুলে ওই ঠান্ডা ঝোড়ো বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর বয়েল।

কিছুক্ষণ খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন উইলিয়ম। আজ সন্ধেয় আর কোনও কাজ যে হবে না, সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন ক্যাবিনেটের সামনে, এক পাত্র ওয়াইন তাঁর নিজেরই দরকার এখন। উঁচুদরের একখানা অস্ট্রেলিয়ান ওয়াইনের বোতল বের করে ঢালতে যাবেন পাত্রে, এমন সময়ে তাঁর চোখ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলে গেল কাচের জানলার টানা প্যানেলের ডান দিকে, যেদিকে তাকালে ডক্টর বয়েলদের কোয়ার্টার এবং এই হোমের পাঁচিল পেরিয়ে অনেক দূরের সেই টিলা, বা সমুদ্রের উপর টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু আর পাথুরে ক্রিক দেখা যায়। তাকালেন, কেননা খুব জোরে, চারপাশকে থতমত খাইয়ে দিয়ে দীর্ঘ এক বিদ্যুৎ চমকানি দিল। সেই চমকের ঝলসানিতে কিছুক্ষণের জন্যই দৃশ্যমান হয়ে ফের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চারপাশের কটেজগুলোর চেহারা, তার পাশের উঁচু-উঁচু গাছ, আর দূরের টিলার খাড়াই। আর সেই ধাতব রুপোলি আলোয় মুহূর্তের জন্য তিনি আবছা দেখতে পেলেন, ক্রিকের একেবারে ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীমূর্তিকে। দূর থেকে আর ওইটুকু সময়ে তার চেহারা বুঝতে না-পারলেও সেই দৃশ্যের ঝলক দেখে থমকে গেলেন উইলিয়ম, কেননা ওই এক ঝলকানির দৈর্ঘ্যেই তিনি দেখতে পেলেন, শ্বেতাঙ্গ ও ছিপছিপে সেই নারীমূর্তির পরনে কিচ্ছু নেই, আর সে, নগ্ন সেই নারীমূর্তি, ওই টিলার মাথা থেকে, বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে, দু'দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি নিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্যে।

ঝাঁপ দিচ্ছে।

সমুদ্রে।

সতেরো

এই সকালটা আর যা-ই হোক, ক্যাব ডাকার নয়। একটি জায়গা থেকে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্য সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে পরপর দরজার কাছে রাখার জন্য নয় এই সকালটা। কড়া কফির দানা অল্প চিনি দিয়ে কাপের নীচে পিষে ফেলতে-ফেলতে সেই ঘূর্ণনের দিকে তাকিয়ে এ-কথা মনে করার জন্য নয় এই সকালটা যে, দেরি হয়ে যাচ্ছে এবার। সদর দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে, তিন তিনটে ভারী লাগেজ আর ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে হু-হু হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য নয় এই সকালটা, যখন বেশ জোরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি আর দূরের পাহাড়ের মাথায় গুঁড়ি-মারা মেঘের দল বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আজ দিনটা ছাই-ছাই রঙেরই হয়ে থাকবে সারাক্ষণ। কিন্তু সেসব কিছু দেখলে এবার সত্যিই দেরি হয়ে যাবে দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারোলের, কেননা কথামতো পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্যাব এসে পড়লেই তাকে রওনা হতে হবে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে, যেখান থেকে সকাল সাড়ে ছ'টার ট্রেন তাকে নিয়ে ছুটবে লন্ডনের দিকে।

ক্যাবটা যখন এসে দাঁড়াচ্ছে ডর্মের ছোট্ট আর কেঠো রঙের দরজার সামনে, আর রেনকোট পরা শ্যোফার এসে ক্যারোলকে সাহায্য করছেন তার ভারী দুটো লাগেজ ডিকিতে তুলে দিতে, তখন ক্যারোলের বাদামি ওভারকোটের ডান দিকের হাতায় এসে লাগছে বৃষ্টির জল। ঠান্ডা, নিঃস্পৃহ আর তরল। বাঁ হাতে সে ধরে আছে ছোট একখানা ছাতা ঠিকই, কিন্তু এমন সকালে ছাতায় সবটুকু যে আটকাবে না, সে-কথা তারও ভালমতোই জানা। দূরে গির্জার ঘড়িতে সকাল পাঁচটা বাজার পাঁচখানা গং পরপর বাজছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির ঝাপসা আওয়াজে তা মিলেমিশে এক তরল শব্দের মিশ্রণ তৈরি করছে।

ক্যারোল একবার তাকাচ্ছে তার বাঁ হাতের কবজিতে আটকে রাখা ডায়ালটার দিকে। গির্জার ঘড়ির চেয়ে যা বেশ কিছুটা দ্রুত ছুটছে। ঘড়িটা বাবা তার তিরিশ বছরের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। ক্যাব, খুব সামান্য ইঞ্জিনের আওয়াজ তুলে গিয়ার নিচ্ছে। নদীটা অনেক দূরে, যেখানে তার থাকবার কথা। ক্যারোল, জানলার কাচ তুলে দিচ্ছে খুব আস্তে-আস্তে, যেভাবে ডকের উপর ব্রিজ উঠে আসে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর জন্য সত্যিই ছিল না সকালটা।

সকালটা আসলে ছিল একটু দেরিতে ভাঙবার জন্য, অনেকটা সম্যকের গতরাতের ঘুমের মতোই। গতকাল রাতে এত বেশি মাত্রায় পানীয় নেওয়া হয়ে গিয়েছে তার যে, মাথা তো ভার হয়েই আছে বেশ ভালরকম, তার উপর অনেক চেষ্টার পরেও, আগুনের ধারে তার আর ক্যারোলের আশ্চর্য নাচ ছাড়া সে প্রায় কিছুই মনে করে উঠতে পারল না, অবশ্য হ্যাঁ, একে যদি কোনও ঘটনা বলা যায় যে, তারা কয়েকজন মিলে নিশুতি ও সুনসান হে অন ওয়াই-এর নিস্তব্ধ রাস্তাগুলোয় কোরাসে কিছু গান গাইতে-গাইতে যার-যার ঠিকানার দিকে ফিরতে চেয়েছিল আর শেষমেশ, সম্ভবত, ডর্মে ফিরে আর কোনও দিকে না-তাকিয়ে নিজের বিছানায় ঝাঁপ দিয়েছিল সম্যক এই ভেবে যে, সে আসলে ওয়াশরুমে-ঢুকে-দরজা-বন্ধ-করা ক্যারোলের বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে।

সকালটা আসলে ছিল এইভাবে, ধীরগতিতে, অল্প একটু মাথাব্যথা আর মুছে যাওয়া স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে শুরু হওয়ার জন্যই, যখন, কাপে গরম জল ঢালতে-ঢালতে, হঠাৎ ভিজতে থাকা বাগানের অদ্ভুত ঝকঝকে সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে সম্যকের খেয়াল হল, আজ সকালেই ক্যারোলের চলে যাওয়ার কথা এই শহর ছেড়ে। এই ভাবনার ধাক্কা, কোনও আবিষ্কারের মতোই, একটু আস্তে বোঝা গেল বলে, জল ঢালতে-ঢালতে উপচে পড়ে সম্যকের আঙুলে এসে লাগল এবং সেই ছ্যাঁকার ঝলকে সে শেষপর্যন্ত এটা বুঝতে পারল, কতখানি দেরিতে ঘুম ভেঙেছে তার। এতখানি দেরিতে ভেঙেছে যে, ভাঙার অনেক আগেই ডর্ম ছেড়ে, সামনের রাস্তা ছেড়ে, নদীর উপর ব্রিজ ছেড়ে, গোটা হে অন ওয়াই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে ক্যারোল। হয়তো তাকে না-ডেকেই। কিংবা হয়তো তাকে ডাকার পরেও কোনও সাড়া না-পেয়ে। আক্ষেপ আসলে যন্ত্রণার মতোই, কেননা সীমা পেরিয়ে গেলে এই দুয়ের ক্ষেত্রেই তার বোধ কাজ করে না। এই ভিজতে থাকা বৃষ্টির পড়ে আসা বেলায় এই গোটা দোতলা ডর্মে সে যে একেবারে একাই আছে, এটা বুঝতে পারামাত্র সম্যকের মধ্যে যা কাজ করে উঠল, তা হল দ্রুততা।

সে কোনওরকমে একটা হুডি জ্যাকেট আর স্নিকার্স পরে চাবিটা পকেটে নিয়ে দরজা টেনে দিয়ে ছুটে চলে এল বাইরে, তারপর বুকের ওপর আড়াআড়ি দু'হাত রেখে ঝোড়ো বৃষ্টির হাওয়াকে কিছুটা আড়াল করে খুব তাড়া পায়ে হাঁটতে থাকল যেদিকে দু'চোখ যায়। খুব বেশি দিকে চোখ চলে যাওয়ার মতো বড় শহরও এটা নয়, আর বৃষ্টি পড়লে যে-কোনও শহরই ভারী আর ছোট হয়ে আসে, কাপড়ের টুকরোর মতোই। আফসোস হচ্ছে, নাকি রাগ হচ্ছে, নাকি কান্না পাচ্ছে, নাকি ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে, নাকি কষ্ট হচ্ছে, এসব কিচ্ছু সে বুঝে উঠতে পারছে না এখন, কেবল উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোট হয়ে আসা এই ভেজা শহরের এক রাস্তা থেকে আর-এক রাস্তায় টহল মারছে ভূতগ্রস্তের মতো, দ্রুতপায়ে, যখন শহরের সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট স্টেশন থেকে ছেড়ে যাচ্ছে একখানা ট্রেন, যার অনেক আগে ক্যারোলকে নিয়ে আরও একখানা ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে সেই একই স্টেশন থেকে।

সম্যক আন্দাজ করতে পারছে, ভোরবেলার ফিকে হয়ে আসা মেঘলা আকাশের নীচে ঠান্ডা চারপাশকে চিরে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে কীভাবে ছুটে গিয়েছে ক্যারোলের ডেকে আনা ক্যাব, আন্দাজ করতে পারছে স্পষ্টই, যদিও সে জানে না কোন মডেলের গাড়ি এসেছিল, কী রঙের পোশাক পরেছিলেন তার শ্যোফার বা কত ছিল গাড়ির নম্বর। তবে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছুটে যাওয়াটা সে আন্দাজ করতে পারছে, কেননা এর চেয়ে কিছু কম বৃষ্টি ছিল না সেদিন কলকাতায়, যেদিন ড্রাইভারকে একশো টাকা অতিরিক্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সে বারবার তাঁকে বলছিল স্পিড আরও বাড়ানোর জন্য।

"বারিশওয়ালা রস্তা হ্যায় বাবু, চক্কা স্কিড কর গয়া তো ফির রব জানে..."

"কিচ্ছু স্কিড করবে না। দেখছেন না, পাশ দিয়ে গাড়িগুলো হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে?"

"আপ শান্তি সে বৈঠিয়ে।"

"আর পনেরো মিনিটে পৌঁছতে হবে কিন্তু, আপনি এখনও উলটোডাঙায় আটকে।"

"বোলা না শান্তি সে বৈঠিয়ে। পন্দরহ মিনট মেঁ এয়ারপোর্ট নহি ঘুসা দিয়া তো ভাড়া মত দিজিয়েগা। ঠিক হ্যায়?"

আলো ঝলমল একখানা পোড়োবাড়ি মনে হচ্ছে কলকাতা বিমানবন্দরকে, যখন ওই বৃষ্টির ধাক্কায় চুঁইয়ে পড়া আলোর সুতো দিয়ে বাঁধা আন্তর্জাতিক টার্মিনালের প্রথম দরজাটায় এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক নিচ্ছে হলুদ রঙের সাধারণ ট্যাক্সি, যে সত্যিই অসাধারণভাবে পেরিয়ে এসেছে এতখানি রাস্তা, সামান্য সময়ে।

এই দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকে যাবার কথা পোর্শিয়ার, আর একবার ভিতরে ঢুকে গেলে সম্যকের সঙ্গে তার এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেখা হওয়ার কোনও সুযোগই থাকবে না, এই ভেবে, টানা পাঁচ দিনের জেদ আর নীরবতাকে ভেঙে ফেলে পোর্শিয়ার জানানো সময়মতো এখানে ছুটে এসেছে সম্যক, এই ভয় পেতে-পেতে যে, এই বুঝি পরিচয়পত্র দেখিয়ে, মালপত্র ঠেলতে-ঠেলতে উজ্জ্বল কালো চোখের ছিমছাম মেয়েটি শান্তভাবে ঢুকে গেল হিমঘরে।

পোর্শিয়ার বাবা আর মা কফি খাচ্ছেন একটু দূরের দোকানে দাঁড়িয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজার সামনে ট্রলির হাতলে থুতনি গুঁজে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোর্শিয়া, যে, ট্যাক্সি থেকে সম্যককে নেমে আসতে দেখে স্পষ্টতই খুশি হয়ে উঠল ভারী।

"আমি জানতাম, তুই আসবি।"

পোর্শিয়ার ঠোঁটের চাদর ফালা হয়ে সরে গিয়ে আলতো মিঠে দাঁতের হাসি একবার দেখা গেল বটে, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে একইরকম হেসে উঠতে পারল না সম্যক, যদিও এও সত্যি যে, হেসে ওঠার কোনও চেষ্টাই তার মধ্যে ছিল না।

"আমি যদিও জানতাম না। আজ সন্ধে পর্যন্তও জানতাম না যে আমি আসব।"

"তোর থেকে আমি চিরকালই তোকে বেশি জানি রে সম্যক, আই নো ইউ বেটার দ্যান ইউ ডু।"

পোর্শিয়া আবারও হেসে উঠে তার সরু আর মেধাবী আঙুলের গুচ্ছ চালিয়ে দিল সম্যকের এলোমেলো চুলগুলোর মধ্য দিয়ে, যেভাবে গমের খেতে ট্র্যাক্টর ঢুকে আসে কোনও অনুমতি ছাড়াই।

"আমি কিন্তু সত্যি এক্সপেক্ট করেছিলাম, তুই একবার ভাববি আমার কথা।"

সম্যকের গলা ততটাই ঠান্ডা, যতটা কলকাতার রাতের রাস্তার হাওয়া, এই বৃষ্টির মরসুমে।

"আমিও তো এক্সপেক্ট করেছিলাম, তুই বুঝবি আমাকে। বাট এনিওয়ে, এটা বোধ হয় এইসব কথা আলোচনার জায়গা নয়, তাই না? আর পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। ফ্লাইট অন টাইম আছে।"

"যা তা হলে, রিপোর্ট কর! আমাকে খামোকা ডাকলি কেন এখানে?"

"তোকে দেখতে ইচ্ছে করল বলে। একবার তোর চুলে আঙুল বোলাতে ইচ্ছে করল বলে। একবার তোকে জাপটে ধরতে ইচ্ছে করল বলে। বাকি যা-যা ঝগড়াঝাঁটি, আমরা স্কাইপ বা ফোনেও করতে পারি। কিন্তু সেখানে জড়িয়ে ধরা যাবে না যে?"

এটুকু বলে ভারী আদর নিয়ে খুব জাপটে সম্যককে চেপে জড়িয়ে ধরল একবার পোর্শিয়া। সম্যকের হাতদুটো আপনাআপনি লকগেটের মতো জুড়ে গেল পোর্শিয়ার পাতলা পিঠের ওপর, যখন সে দেখতে পেল দূরে, আর-এক দফা বৃষ্টি নেমে এগিয়ে আসছে এয়ারপোর্টের দিকেই।

"আমি সিরিয়াসলি জানি না পোর্শিয়া, এতদিন এতদূরে থেকে আমার পক্ষে..."

"বলতে হবে না। যদি না পারিস, জানব আমি তোর কাছে যেতে পারিনি তেমন করে। বুঝলি? এলে তো দেখা হবেই, আর আমি চিঠি লিখব। তুই ইচ্ছে হলে উত্তর দিস। আর কিছু যদি না-ও থাকে সম্যক, এই বন্ধুত্বটা থাকবে। অন্তত আমার দিক থেকে থাকবে। দিস ইজ় আ প্রমিস। ফেরার পথে ভিজবি না, কেমন?"

এইটুকু বলে মুখ ঘুরিয়ে বাবা মা-র দিকে হেঁটে গিয়েছিল পোর্শিয়া, আর তার আরও একবার ফিরে তাকানোর অপেক্ষা না-করেই টার্মিনাল থেকে দক্ষিণগামী বাস ধরে নিয়েছিল সম্যক এবং সে, পোর্শিয়ার বলে দেওয়া কথা মানবে না বলেই একরকম, রুবিতে নেমে পড়ে বাকি পথটা ভিজেছিল। গত তিন বছরে সে নিজে, হয়তো-বা মনখারাপ, হয়তো-বা জেদ, হয়তো-বা অহং, হয়তো-বা অভিমান থেকে আস্তে-আস্তে পোর্শিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে এনেছে, এটা জেনেই যে, পোর্শিয়া এখনও তাকে সেই একভাবেই আগলে রাখতে চায়, কিন্তু সেদিন সে বাকি পথটা ভিজেছিল। সে দিনের পর দিন পোর্শিয়ার চিঠির উত্তর দেয়নি, তার মেসেজের জবাব দেয়নি, শুধু তাকে বিচ্ছিন্নতার কষ্টের দিকে ইচ্ছে করে ঠেলে দেওয়ার জন্যই, এটা ঠিক, কিন্তু এও ঠিক যে, বাকি পথটুকু সেদিন সে ভিজেছিল। আর কারও প্রতি কোনওরকম বন্ধুতা, ভালবাসা, দুর্বলতা, প্রেম, কিচ্ছু তৈরি না-হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রাণপণে পোর্শিয়াকে আবার জড়িয়ে ধরতে চাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে ভারী উদাসীন ভাব করে কাটিয়ে দিয়েছে এতগুলো বছর, কিন্তু সেদিন ফেরার পথে অনেকখানি সে ভিজেছিল। গত বছর আগস্টে পোর্শিয়া যখন দু'হপ্তার ছুটিতে দেশে ফেরে, তখন হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও সম্যক একবার, মাত্র একবারও দেখা করতে রাজি হয়নি, এমনকী পোর্শিয়াকে তাদের বাড়িতে পর্যন্ত আসতে দেয়নি, অথচ সেদিন, বাকি পথটুকু সে ভিজেছিল। খুব জোর ভিজেছিল, যাতে জ্বর এসে যায় ভালমতো। খুব জোর ভেজা, ঠিক আজকের মতো, সারা পথ ধরে, একা-একা, উদ্দেশ্যবিহীন, বৃষ্টির রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে। আজ অবশ্য সন্ধে নেমে আসার সময় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে ভারী হয়ে আসা পাহাড়ের আবছা রেখা আর মেঘের চেয়েও বেশি করে কুয়াশা নেমে আসছে এই পাহাড়ি নদীর শহরে, কিন্তু পথঘাট গুলিয়ে যেতে চাইছে সম্যকের।

খাওয়া হয়নি সারা দিন, কেবল স্নানের পর স্নান হয়েছে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে। কেবল চুপ করে থাকার পর চুপ করে থাকা। কথা বলতে ইচ্ছে করেছে যার সঙ্গে, ভীষণভাবে কথার পর কথা বলেই যেতে ইচ্ছে করেছে কেবল, তার ফোন সারা দিন ধরে বন্ধ। কেবল একখানা মেসেজ রেখেছে সম্যক, যাতে লেখা, "তোমার সঙ্গে আর-একবার দেখা হওয়া খুব জরুরি। আমার জন্য। পারলে রাজি হোয়ো। আমি চলে যাব লন্ডনে।" ঘোরের মধ্যেই মেসেজ টাইপ করেছে সম্যক, কিন্তু বানান ভুল হয়নি।

ডর্মে যখন ফিরেছে সম্যক, গতকালের পানীয় আর আজ সারা দিনের ভেজার কারণে মাথা, শরীর, চোখ, সমস্ত ভারী আর অবশ হয়ে এসেছে। সন্ধেও হয়ে এসেছে একইরকম ভারী ও শীতল। ফ্রিজে কিছু ঠান্ডা মাংস রাখা ছিল, কোনওরকমে সেটা ছিবড়ে করে খেয়ে যখন বিছানায় নিজেকে, নিজের অসম্ভব বেশি ভারী হয়ে ওঠা শরীরটাকে এলিয়ে দিতে যাবে সম্যক, তখন তার খেয়াল হল, বিছানায়, তার বালিশের পাশে, একটা বই রাখা। পুরনো বই। কাল রাতেও যেটা এখানে ছিল না, আর আজ সকালে নেহাত তাড়াহুড়োয় যাকে দেখতে পায়নি সম্যক।

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলছে। তাতেই সে হাতে নিয়ে দেখতে পেল, বইটা তার ভারী চেনা। ধূসর পাণ্ডুলিপি। যদিও এত পুরনো সংস্করণ সে এর আগে দেখেনি কোনওদিন। তার পাতাগুলো হয়ে এসেছে হলদেটে আর খড়মড়ে। প্রথম পাতাটার উপরের কোনায় একটা লেখা দেখে প্রথমবার চোখ আটকে গেল সম্যকের। সেখানে সই করা আছে উইলিয়ম ব্রাইট, নীচে লেখা, কলকাতা। তারপরের পাতায় আরও একবার আটকাল চোখ, যখন সে দেখল, বইখানা ধূসর পাণ্ডুলিপির প্রথম সংস্করণ এবং প্রথম মুদ্রণ। শরীরে একটা কাঁপুনি দিচ্ছে বলেই, জ্বর থেকে রোমাঞ্চ আর মনখারাপকে আলাদা করে টেনে বের করা যাচ্ছে না আজ।

চোখ ভারী হয়ে আসছে সম্যকের... বৃষ্টির মতোই ভারী।

বইটা ভারী হয়ে আসছে তার হাতে... কুয়াশার মতোই।

সে, ঘুমিয়ে পড়বার আগে, কোনওরকমে বইটাকে তুলে নিয়ে বেডসাইড টেবল-এ পড়ে থাকা তার নিজের নিয়ে আসা অন্য একখানা বইয়ের উপর আড়াআড়ি শুইয়ে রাখল।

সে-বইটার নাম এরিয়েল।

আঠারো

—আপনি কি এখানে আগে কোনওদিন এসেছেন?

—নাহ, এই প্রথম। আর আপনি?

—আমিও আগে কোনওদিন এরকম জায়গায় আসিনি। সত্যি বলতে কী, এত বই একসঙ্গে দেখিওনি কোনওদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি দেখেছি, এত না-হলেও, আমাদের শহরের বড় দোকানগুলোয় টানা বইয়ের র‍্যাক দেখেছি, কিন্তু সেসবও এর তুলনায় অনেকটাই ছোট বলে মনে হচ্ছে এখন।

—আমার শহরে, মানে, পরে যখন শহরে এসেছি আর কী, এতবড় বইয়ের দোকান দেখিনি কখনও। অবশ্য বই ছাপা আর বিক্রির জন্য আলাদা পাড়া ছিল সেখানে, কিন্তু একসঙ্গে এত বই...

—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি যদিও আমার, কিন্তু বহুদিন পর কাউকে টেবল-এর সামনে খাতা আর কলম নিয়ে বসে থাকতে দেখে ভাল লাগল। আমি অনেক ছোটবেলায় খাতা আর কলমে লিখতাম। আপনি এখনও সেভাবে লেখেন দেখে...

—আমার যদিও অবাক লাগল, আপনাকে এই চেয়ার টেবলে এভাবে দেখে, মানে, টাইপরাইটারের সামনে দেখে। যতদূর মনে পড়ছে, আমি কখনও টাইপরাইটার নিয়ে কোনও তরুণী বা মহিলাকে বসে লিখতে দেখিনি। যাঁদের দেখেছি, তাঁরা সব পুরুষ। হয় মুরুব্বি, নয় কেরানি। আপনাকে এই প্রথম দেখলাম এভাবে...

—আমি অনেকদিনই টাইপরাইটারে লিখি। আমাদের চারপাশে সকলে তাই লেখেন। সে ব্যাংকের লেজার হোক বা প্রবন্ধ। সুবিধে হয়। আচ্ছা, আমিও কিন্তু আপনার মধ্যে প্রথম একটা ব্যাপার দেখলাম।

—তাই? কীরকম?

—এই পোশাক, যা আপনি পরে আছেন, কোনও পুরুষকে কখনও পরতে দেখিনি। যদিও আমি ব্রিটেন আর আমেরিকা ছাড়া যাইনি কোথাও...

—ও হো, এ আমাদের রোজকার পোশাক। ধুতি আর পাঞ্জাবি। পুরুষদেরই পোশাক। অবশ্য শার্ট প্যান্টও আছে। আমি কিন্তু অনেক বিদেশি মহিলাকে এই আপনার মতো ছড়ানো গাউন পরতে দেখেছি কলকাতায়। ভারী চমৎকার পোশাক।

—বেশ বেশ, আলাপ হয়ে ভাল লাগল। কিন্তু কী এক অদ্ভুত জায়গায় আলাপ হল বলুন তো? এই একটু আগেও তো এ জায়গাটা ছিল না, তাই না?

—হ্যাঁ, ছিল না। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন চিরকাল এইখানে এইভাবেই ছিল, এতটাই প্রাচীন।

—কী আশ্চর্য! মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের মাঝখানে কীভাবে তৈরি হতে পারল এইরকম একটা স্পেস? আর আমরাই-বা কোত্থেকে ভাসতে-ভাসতে এসে জড়ো হলাম এখানে? স্মৃতি কাজ করছে না আমার।

—আমারও। কেবল মনে হচ্ছে অন্য কোথাও ছিলাম, কোনও এক অন্ধকারে, অথবা আলোয়, ঠিক জানি না। আর পলক ফেলতে এই বইয়ের সারির জগতে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। অদ্ভুত ব্যাপার।

—এরকম আগে হয়েছে আপনার? আলো অন্ধকার থেকে হঠাৎ কোথাও চলে গিয়েছেন?

—হয়েছে হয়তো, কিন্তু সেসব জায়গায় কারও সঙ্গে দেখা হয়নি কখনও। আর, আর এত বই দেখিনি কোথাও।

—সত্যিই, কী অন্যরকম, না? দু'পাশে যতদূর চোখ যায় কেবল বইয়ের র‍্যাক, ডান দিক, বাঁ দিক, তার শেষ দেখা যাচ্ছে না, দেখুন একবার...

—তাই তো দেখছি। কত কত পুরনো বই, মনে হচ্ছে বেশ প্রাচীন সব বই, তাই না? আর উপরে তাকান একবার? ঘাড় উঁচু করে? দেখুন, কোথায়, কত উঁচুতে উঠে গিয়েছে বইয়ের সারি, শেষ দেখা যাচ্ছে না, আবছা আলো থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে উঁচু হতে হতে...

—একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, এই যেমন আমি এখন আপনার মাথার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আপনার পিছনেও একের পর এক, যত দূর চোখ যায়, এইরকম উঁচু সব পুরনো বইয়ের র‍্যাক... ভাল করে দেখুন তো, আমার পিছনেও নিশ্চয়ই তাই?

—দেখি... ঠিক বলেছেন। কেবল বইয়ের সারির পর সারি। চোখটা বিশেষ জোরালো নয় আমার, কিন্তু দেখে তাই মনে হচ্ছে।

—হুম, তা হলে এটা বই দিয়ে বানানো একটা স্পেস। তার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি কোনওভাবে।

—আটকা পড়েছি বলুন, কোনও দিকে কোনও দরজা দেখতে পাচ্ছি না যে।

—দরজা দিয়েই দেয়াল তৈরি হলে আলাদা করে আর দরজা পাবেন কোথায়? বইয়ের চেয়ে ভাল দরজা আর কিছু আছে কি?

—তা যা বলেছেন আপনি। যথার্থই মনের মতো একখানা কথা বটে। বইয়ের চেয়ে ভাল দরজা আর কোথায়ই-বা। কিন্তু পায়ের নীচে এরকম কালো, শীতল, টলটলে জল এল কোত্থেকে? এটা কি তবে কোনও নদী? কোন সময় এটা, রাত? বেশ অন্ধকারই তো চারদিক।

—রাত আর দিন তো আলাদা করে বুঝি না অনেকদিন, কিন্তু হ্যাঁ, হয়তো নদী। কে জানে, হয়তো এই জলের তলায় অনেক অনেক প্রাচীন গুল্ম আর মাছেদের দল ভেসে বেড়াচ্ছে, এই বইয়েদের মতোই। বলা তো যায় না? তাদের সব এক-এক রকমের মলাট, এক-এক রকম গল্প এক-এক জনের, না?

—তা ঠিক। কালো ঘন জলের নীচে কত কী থাকতে পারে, উপর থেকে দেখে তো বোঝার উপায় নেই। তবে জলটায় কেমন যেন গতি নেই বিশেষ, কেমন যেন স্থির। মানে, কোত্থেকে আসছে আর কোনদিকে বয়ে যাচ্ছে, ঠাহর করা মুশকিল, তাই মনে হচ্ছে না, বলুন?

—তা ঠিকই বলেছেন। থেমে আছে যেন। জমে আছে তরল হয়েও। অথচ জল যে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

—আর এখন যে রাত, এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই আমার। জল যখন বয়ে যাচ্ছে, জানেন, সে যত ধীরেই হোক, তার যাওয়ার একটা দিক নিশ্চয়ই আছে। সে নিশ্চিত কোনও একদিকে বয়ে চলেছে। আর বয়ে যখন চলেছে, তখন এখান থেকে বেরনোর একটা উপায় আছেই। থাকতেই হবে। একবার এই জলের গতিবিধি বুঝতে পারলে, আর একবার আলো ফুটলে, আমরা ঠিক বেরনোর রাস্তা পাব।

—সে কখন হবে, তা কি বলা যায়? আগে তো ঘড়ি ছিল, চব্বিশ ঘণ্টার বিরক্তিকর হিসেব ছিল, এখন সেসব না-থেকে, জানেন, একরকম ভালই হয়েছে। কখন দিনের আলো ফুটবে, তা যদি আগে থেকে জেনেই গেলাম, তা হলে মজা কোথায়? এখন বেশ লাগে। দেখা যাক, কখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকার একটু ফিকে হয়...

—আপনি, আপনি লেখেন? মানে...

—না না, সেরকম কিছু না। টাইপরাইটার মুখে নিয়ে বসে থাকাটা আমার কলেজবেলার অভ্যেস। অনেকে যদিও বলেন, আমি লিখি, কিন্তু আসলে যা ইচ্ছে টাইপ করতে থাকি। আপনি? লেখেন?

—আমি? লেখবার কথা ভাবি।

—হুম।

—আপনি কী লেখেন? প্রবন্ধ? কবিতা?

—কবিতা বলতে পারেন একরকম। লিখি কি না জানি না, চেষ্টা করি। ওই, চোখের সামনে যেমন সব দেখতে পাই আর কী, সেইভাবে। উপন্যাস লিখেছি একখানা... আপনি?

—আমি লিখি। আর লিখতে লিখতেই ফারাক বোঝার চেষ্টা করি।

—ফারাক? কিসের?

—উপন্যাস আর কবিতার। মাঝেমধ্যেই গুলিয়ে যায়, জানেন? কোনটার মধ্যে আছি, ঠিক ঠাহর করতে পারি না।

—তা যা বলেছেন। অত সহজে যদি বোঝা যেত... আপনার লেখা পড়বার ইচ্ছে থাকল কিন্তু।

—সে তেমন পড়বার মতো কিছু নয় বোধ হয়। আমাদের শহরে দু'-একজন ছাড়া কেউ সে সবকে লেখা বলে গণ্যই করে না তেমন। বই বেরিয়েছে, এই আর কী।

—বই কিন্তু বেশ একখানা ব্যাপার, কী বলেন, হ্যাঁ?

—হুম। কিন্তু অনেক বই একসঙ্গে দেখলে কেমন একটা ভয়-ভয় করে, না? অজানার ভয়? এই এত-এত না-পড়া পাতার মাঝখানে বসে থাকার ভয়, যখন এও জানি না যে, কোন পাতা খুললে কী লেখা দেখতে পাব? হারিয়ে যাওয়ার একটা ভয় কাজ করে, না?

—তাই? ভয়? আমি এভাবে কোনওদিন ভাবিনি আসলে। বিরক্তিও কাজ করতে পারে। বই একসময়ে দু'চোখের বিষও হয়ে উঠতে পারে। জানি না ঠিক... আচ্ছা, আমাদের টেবলগুলো কি একটু একটু দুলছে? টের পাচ্ছেন আপনি?

—ঠিক বলেছেন। বললাম না, স্রোতের চাড় একটা থাকতেই হবে। জল বলে কথা।

—কে জানে, হয়তো নকশায় কোথাও গন্ডগোল হয়েছে কিছু, স্পেসটা পালটাচ্ছে কোথাও...

—আপনার ঠান্ডা লাগছে না জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে?

—মনে হচ্ছে না, জানেন। ঠান্ডার বোধটাই আমার কমে এসেছে। আগে লাগত খুব, ঠান্ডা। অনেক সময়ে ব্যথা হত পায়ে, গামলার জলে পা চুবিয়ে বসে থাকতে-থাকতে ঘুমিয়েও পড়তাম কখনও। উঠে দেখতাম, পা দুটো যায়নি কোথাও। ভারী মনখারাপ হয়ে যেত আমার। এখন অথচ, দেখুন, এই নাম-না-জানা জলের তলায়, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমার পা দুটো শেকড়ের মতো নেমে নেমে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে নীচের দিকে, যেন তারা নামতে নামতে নামতে নামতে একসময় শাখা-প্রশাখা মেলে খুব ধীরগতিতে গেঁথে যাবে পলির মধ্যে। ঠান্ডা লাগছে না আর...

—আর আমার মনে পড়ছে কাদা। জল মানেই কাদা। পায়ের চাপে, গায়ের ওপর ছিটকে আসা কাদা। অন্যের কথায়, অন্যের কলম থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা কাদা, পাঞ্জাবি নোংরা করে দেওয়া। আর মনে হচ্ছে শাল, গ্রাম থেকে আনা শাল গায়ে মুড়ি দিয়ে এমন একখানা ভাব করা, যেন কেউ দেখতে পাচ্ছে না আমাকে, আর আমিও দেখতে পাচ্ছি না কাউকে, এইরকম। ঠান্ডা লাগে আমার এখনও। শিকড়ের কথা বলছিলেন না আপনি? শিকড় কেটে নিলে দাগ থেকে যায়, জানেন তো? হাঁ মুখ হয়ে থাকে। ওখানে, ওখানে খুব ঠান্ডা লাগে...

—কী লাভ এত সব ভেবে, মিস্টার... এহে, দেখেছেন, এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, অথচ নিজেদের পরিচয়টাই... আপনার নামটা?

উনিশ

"একেবারেই ব্যর্থ হয়েছি আমি মার্থা, সম্পূর্ণ ব্যর্থতা হয়তো-বা একেই বলে। আজ, এখন সেটা বুঝতেও পারছি। আগে যে বুঝিনি তা নয়, মনেও হয়েছে একটু-একটু করে, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি জানো, কিছুই, কিচ্ছু করে হয়ে ওঠা হয়নি আমার..."

মেঘ করে থাকাটা এই পাহাড়ি সমুদ্রের বসতিতে নতুন কিছু নয়, নতুন কেবল এই কথাটা, যা এখন উইলিয়ম বলছেন, আর মার্থা শুনছেন। শুনছেন তিনি ঠিকই, কিন্তু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, কেননা উইলিয়ম ব্রাইটের মুখে নিজের ব্যর্থতার কথা বাইরের লোক বড় একটা শোনেনি। বিস্মিত অবশ্য হচ্ছেন না মার্থা, বদলে এ-সমস্ত শুনে একটু বেশিই মনখারাপ হতে চাইছে, তার কারণ বোধ হয় এই যে, আজ উইলিয়মকে বাইরে থেকেও ভারী বিক্ষিপ্ত আর অস্থির দেখাচ্ছে, যা তাঁকে মোটেই দেখায় না অন্যান্য দিন।

তার কারণ অবশ্য কেবল এই আন্তরিক ব্যর্থতা না-হয়ে, সকালবেলার ঘটনাও হতে পারে।

সকাল ঠিক নয়, বেলা পড়ে আসার পরপরই দূরের সেই টিলা বা ক্রিক-এর ঠিক নীচটাতে, সমুদ্র ঘাড়ে করে বয়ে এনে পাথরের খোঁচা মারা এবড়ো-খেবড়ো শরীরের উপর আছড়ে ফেলে রোলির নিস্পন্দ, ক্ষতবিক্ষত, ফুলে-ওঠা পোশাকহীন শরীর, সামান্য কিছু অব্যর্থ চিহ্ন ছাড়া যাকে আর রোলি বলে চেনার কোনও উপায়ই ছিল না ততক্ষণে।

আগের দিন সন্ধেবেলায়, ডক্টর বয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই ওই দৃশ্যটা দেখামাত্র দিশাহারা হয়ে পড়েন উইলিয়ম, সেই উইলিয়ম, যিনি বহু বিপদেও মাথা ঠান্ডা রাখার আদব জানেন বেশ ভালমতোই। কিন্তু একজন মানুষ, তাঁর চোখের সামনে, অথচ হাতের বহু দূরে ঝাঁপ দিচ্ছে শেষবারের মতো এবং অসহায় হিসেবে তিনি, সম্ভবত একা তিনিই সেটা দেখতে বাধ্য হচ্ছেন, এ-জিনিস অতি স্থির মানুষকেও বিচলিত করে তোলবার জন্য যথেষ্ট।

"আপনি ঠিক দেখেছেন? নগ্ন নারীমূর্তি?"

'নগ্ন' শব্দটার উপর একটু বেশি চাপ দিয়ে টেলিফোনের ওপার থেকে প্রশ্নটা করেছিলেন অফিসার, যখন উইলিয়ম, গতকাল সন্ধেবেলাতেই ঘটনাটা তাঁকে জানান। ততক্ষণে ডক্টর বয়েলের তাঁর ঘরে আসা ও চূড়ান্ত অসংলগ্ন ব্যবহার করার ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে উইলিয়মের কাছে যে, সে-কথা আর বলা হয়নি অফিসারকে।

রাতে একবার পুলিশ আসে, উইলিয়মকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সম্ভবত অ্যালঝাইমার্স রোগী বলে গোড়ার দিকে গুরুত্ব কিছুটা কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে চাইছিল তারা, যতক্ষণ-না উইলিয়ম তাদের বোঝান এই বলে যে, অ্যালঝাইমার্স রুগিরা অতীতকে ঝাপসা দেখে ঠিকই, বর্তমানকে নয়। সকাল থেকে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েও কিছু পায় না, যদিও গোটা হোমের চারপাশে তারা নিজেদের কাজ করে যেতে থাকে। ডক্টর বয়েল সকাল থেকে বেরোননি নিজের কটেজ ছেড়ে। সত্যি বলতে কী, আগের দিন সন্ধেয় বাড়ি ফিরে তিনি আর রোলির খোঁজই করেননি ভয়ে-ভয়ে। স্টাডিতে দরজা টেনে শুয়ে পড়েছিলেন নিঃশব্দে। সেই ঘুম ভাঙে তাঁর একেবারে বেলায়, যখন বাইরে ছেয়ে এসেছে গতকালের চেয়ে কিছু বেশি হালকা মেঘের আস্তরণ, আর জলের ধাক্কায় বারেবারে পাথরে আছড়ে পড়ে আরও বিক্ষত হতে থাকা নগ্ন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তারস্বরে গর্জন করে উঠেছে পুলিশের কুকুর, একটি ল্যাব্রাডর ও একটি মুশকো জার্মান শেফার্ড।

রোলির অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ এবং শরীরের অনেক জায়গা সম্পূর্ণ থেঁতলে গিয়েছে পাথরে ধাক্কা খেয়ে। বাঁ দিকের স্তনবৃন্তের অনেকখানি খুবলে খেয়ে নিয়ে গিয়েছে দাঁতাল কোনও মাছে, যে-স্তনবৃন্ত, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই মহাকাশযানের মতো নেমে আসতে চাইছিল ডক্টর বয়েলের মুখের উপরে। মরে যাওয়া শরীরটার ধারে কয়েক সেকেন্ড কেবল দাঁড়িয়েছিলেন উইলিয়ম, এত ক্ষত সত্ত্বেও রোলিকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল না তাঁর। ডক্টর বয়েলকে খবর করার কথা পুলিশকে জানিয়ে তিনি ফিরে আসেন নিজের কটেজে। পুলিশ টিলার পাশের আগাছার ঝোপ থেকে একটিই জিনিস খুঁজে পায়, তলা থেকে মাঝখান পর্যন্ত রক্তলাগা, সাদা, পুরু আর দীর্ঘ একখানা মোমবাতি।

ডক্টর বয়েল রোলির অসাড় শরীর দেখার পর এমন উন্মাদনা শুরু করেন যে তাঁকে সেডেটিভ ইনজেক্ট করা ছাড়া উপায় থাকে না। পুলিশ আপাতত পাহারায় আছে, তাঁর জ্ঞান ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেই। কানাঘুষো যেটুকু শোনা যাচ্ছে, তাতে আপাতত ডক্টর বয়েলকে তারা নিয়েও যেতে পারে। এই গোটা ঘটনায় উইলিয়মের মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকাটা স্বাভাবিক, বিশেষত তিনি নিজে যখন গতকাল সন্ধেবেলা রোলিকে ঝাঁপ দিতে দেখেছেন। কিন্তু তা হলেও, নিজের কাজের ব্যর্থতার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ থাকবার যে কথা নয়, তা দিব্যি বোঝেন মার্থা।

"তুমি কেবল একটু ঠান্ডা হও উইলিয়ম, শান্ত হও একটু। তোমার স্নায়ুর উপর গতকাল রাত থেকে ভারী চাপ পড়ছে, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? এখন কি এইসব কথা না-বললেই নয়? চলো, বাগানের বেঞ্চটা আজ খালিই আছে, বসে সমুদ্র দেখা যাবে'খন। দু'পেয়ালা চা নিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে বসি বরং। কী, যাবে?"

মার্থার নরম, অল্প কাঁপা-কাঁপা গলায় সোয়েটার বোনার মতো একখানা নকশাদার যত্ন ছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় যা মানুষকে মিহি করে ফেলতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তা হল না। বরং ফল হল উলটো। সমুদ্রের কথা শোনামাত্র উইলিয়ম বেশ কিছুটা তেতেই উঠলেন যেন, আর যেমনটা আন্দাজ করছিলেন মার্থা একটু আগেই, টান মেরে বাদামি সোয়েটারখানা খুলে ফেললেন তিনি। তাঁর রুপোলি চুল আরও একটু এলোমেলো হয়ে উঠল।

"সমুদ্র দেখার কথা আর একবারও আমায় বলবে না তুমি মার্থা, দোহাই তোমার। এই কটেজের কাচ ভেদ করে, ওই বাগানের বেঞ্চের উপর বসে সমুদ্র দেখতে-দেখতে আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। এভাবে তাকিয়ে থাকাকে সমুদ্র দেখা বলে না মার্থা, তা তুমিও জানো ভাল করে। ক্যালেন্ডারের পাতায় বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে সমুদ্র দেখা আর এভাবে সমুদ্র দেখার মধ্যে কোথাও যে কোনও ফারাক নেই, তা কি বোঝো না তুমি?"

"তা বুঝি উইলিয়ম, তা তো বুঝি। কিন্তু তুমি তো জানো এখানে আমাদের সমুদ্রের ধারে যাওয়া বারণ। কেউ দেখতে পেলে ঝামেলা করবে, পরদিন হাজারটা প্রশ্ন। তা ছাড়া, আজ যা হয়ে গেল, তারপর তো আরওই বোধ হয়..."

"যতক্ষণ-না পায়ের তলায় খচমচ করছে ভিজে যাওয়া নরম বালি, যতক্ষণ-না জোর সোঁদা হাওয়ার ঝাপটায় উড়ে যাচ্ছে চুল, যতক্ষণ-না বারবার এসে কুকুরের মতো পা চেটে দিয়ে যাচ্ছে ফেনাওলা ঢেউ, ততক্ষণ সমুদ্র দেখাকে সমুদ্র দেখা বলে না মার্থা, সান্ত্বনা আমার আর ভাল লাগে না, এটুকু বোঝার চেষ্টা করো, দয়া করে..."

উইলিয়মের মধ্যে, সম্ভবত এই প্রথমবার, প্রাজ্ঞ গবেষক ও নামী অধ্যাপককে ছাপিয়ে একজন বিরক্ত অভিমানী শিশুকে জেগে উঠতে দেখছেন মার্থা। দেখছেন, আর ভারী অসহায় বলে মনে হচ্ছে তাঁর নিজেকে। তবু তিনি বললেন, "তোমাকে সান্ত্বনা দেবার আমি কে, উইলিয়ম? পৃথিবীজোড়া খ্যাতি তোমার..."

"ব্যর্থতার একটা খ্যাতি হয়, বোঝো? মার্থা? ব্যর্থ খ্যাতি? সেইটা। সেইটা সারা জীবন ধরে গুছিয়ে অর্জন করেছি আমি। এখন আর ফেলে দেবার কোনও উপায় নেই। একবার। একবার অন্তত আজ আমাকে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। উপায় নেই কোনও।"

"তোমার মধ্যে এমন অস্থিরতা আমি আগে দেখিনি উইলিয়ম, আমার ভয় করছে।"

"আমিও দেখিনি আগে। আমারও ভয় করছে। সারা জীবন মরীচিকার পিছনে ছুটে মরার জন্য যে সময় নষ্ট হল, তার হিসেব করতে বসার ভয়।"

"কিন্তু কেন? কেন বারবার নিজেকে ব্যর্থ বলছ তুমি উইলিয়ম? তোমার এত বছরের এত-এত কাজ তো আর হঠাৎ মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না।"

"ঠিকই বলেছ মার্থা, তারা হঠাৎ মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। কেননা তারা গোড়া থেকেই মিথ্যে ছিল।"

চা প্রস্তুত। কেটল-এর সিটিটা, ঠিক থিয়েটারের থার্ড বেলের মতোই বেজে উঠল আর মার্থা খেয়াল করলেন, বাইরে সন্ধে নেমে গিয়েছে কখন যেন, যার আবছা গোলাপি আর বেগুনি হয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে দূরের সমুদ্রকে চেনা যাচ্ছে তার ভাসন্ত চিকচিক দিয়ে কেবল, যেদিকে আজ চলে যেতে চাইছেন তাঁর বন্ধু। উইলিয়ম।

চা নামিয়ে দুটো পাশাপাশি সাজানো পেয়ালায় ঢেলে একখানা নিজের হাতে তুলে নিলেন মার্থা, অপরটি সাজানো থাকল উইলিয়মের জন্য।

"তুমি যখন এই প্রসঙ্গ থেকে বেরোতেই চাইছ না উইলিয়ম, তা হলে দয়া করে বলবে, কেন নিজেকে ব্যর্থ মনে হচ্ছে তোমার?"

"সমস্যা হল মার্থা, আমার অসুখটা সারতে শুরু করেছে, যদি আদৌ সেটা অ্যালঝাইমার্স হয়ে থাকে। তোমারও হয়তো তাই। কিংবা বলা যায় আমরা অল্প অসুখ আর প্রচুর টাকাপয়সা নিয়ে এখানে এসে ভর্তি হয়েছি।"

"এসব কথা বলছ কেন হঠাৎ?"

"কেননা, আমি ভুলে যাওয়াটাকে, স্মৃতির পুরোপুরি মুছে যাওয়াটাকে চাইছি এখন, কিন্তু পাচ্ছি না। অ্যালঝাইমার্স খুব শক্তিশালী রোগ। ব্যর্থতাও নিশ্চয়ই ভুলিয়ে দিতে পারে সে?"

উইলিয়ম ক্যাবিনেট থেকে একখানা ছোট বোতল টেনে বের করলেন, রেড ওয়াইনের। এ সময়ে তাঁকে সুরা পান করতে দেখা যায় না বটে, সে-কথা মার্থাও জানেন, তবে হ্যাঁ, আজকের ব্যাপার আলাদা। উইলিয়মের স্নায়ু শান্ত হওয়া প্রয়োজন। আর তার জন্য চায়ের চেয়ে ওয়াইন অনেক ভাল টোটকা। মার্থা আর কোনও প্রশ্ন করবেন না বলেই স্থির করেছেন, বলে যেতে দেওয়া, নিজের সমস্ত কথা বলে যেতে দেওয়াই এই মুহূর্তে একমাত্র স্বস্তির পথ, দু'জনের কাছেই। সম্ভবত উইলিয়মও আর কোনও প্রশ্ন আলাদা করে আশা করছিলেন না। তাই রেড ওয়াইনে বেশ করে ঠোঁট আর গলা ভিজিয়ে, পরদা সরিয়ে কাচের প্যানেলটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তিনি নিজেই বললেন, "তুমি কি এ কথা বিশ্বাস করবে মার্থা, অনুবাদ বলে কিছু হয় না? কিংবা, আসলে সব কিছুই অনুবাদ?"

বিশ্বাস করা পরের প্রশ্ন, প্রাথমিকভাবে এই বাক্যের মানেই উদ্ধার করতে পারলেন না মার্থা। তাঁর প্রতিফলন কাচের প্যানেলে, সমুদ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

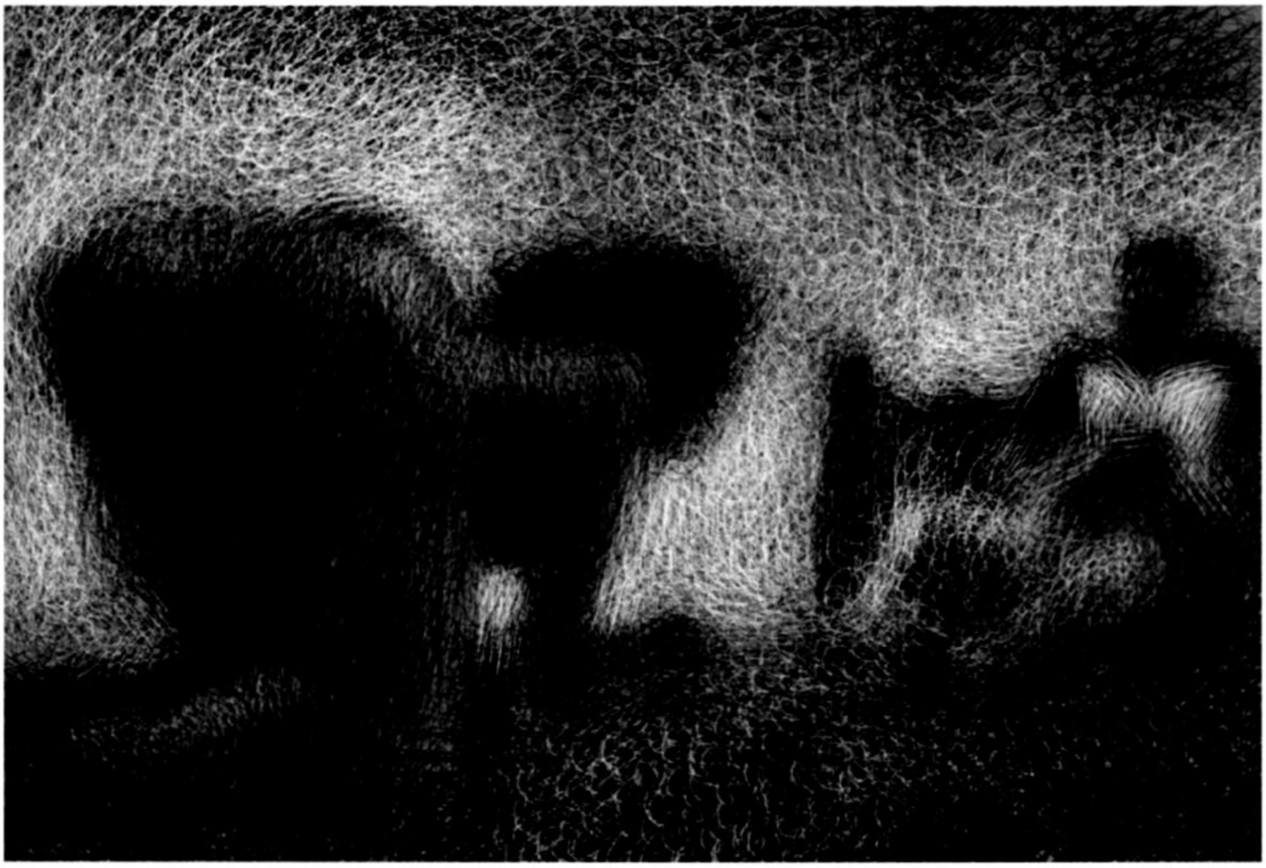

আজ, এই মুহূর্তে, রোলির শরীরে কোনও পোশাক নেই। সম্পূর্ণ সুতোহীন অবস্থায় রোলি স্থিরভাবে দাঁড়ানো, বিছানার ঠিক অপর প্রান্তে, ডক্টর বয়েলের পায়ের দিকে, তাঁর চোখে সটান তাকিয়ে।

পিঠোপিঠি ফুটে উঠেছে দেখে, কেবল মাথা নেড়ে 'না' জানালেন তিনি, যা উইলিয়ম দেখতে পেলেন সহজেই।

"স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। অন্তত আমার মুখ থেকে শুনে কেউ এ-কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না আমি জানি, তবু আজ আমি তোমাকে বলছি, এই যে অনুবাদ নিয়ে পড়ে থাকলাম সারাটা জীবন, সেই অনুবাদ আসলে কিচ্ছু নয়, ভাঁওতা। স্রেফ মানুষের চোখে ধুলো দেবার একখানা শিক্ষিত, সভ্য উপায়, ব্যস।"

এবারে আর প্রশ্ন না-করে থাকতে পারলেন না মার্থা।

"আমাকে বোঝাও তা হলে। কেননা, অনুবাদ না-থাকলে পৃথিবীর নানা প্রান্তের সাহিত্য তো পড়তে পেতাম না, তাই না? পৃথিবীতে এত-এত ভাষা, তার ক'টা আমরা জানি? একটা? দুটো? বা তোমার মতো পাঁচ-সাতটা? বাকি ভাষার সাহিত্যের কাছে পৌঁছতাম কী করে, যদি না তোমার মতো সেতু তৈরি করবার লোকজনেরা থাকত? রেজ়ারেকশন আমার খুব প্রিয় উপন্যাস, জানো? কিন্তু ইংরেজিতে পড়ে। তুমি বলছ, সেটা ভাঁওতা?"

উইলিয়ম ঘুরে দাঁড়ালেন এবার, এই ভর সন্ধেবেলা, ঘরের মধ্যে থেকেও তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে, দ্রুত আর-এক পাত্র ওয়াইন নিয়ে ফের জানলায় মুখ সেঁটে দাঁড়ালেন তিনি। মার্থা জানেন, তাঁর প্রশ্নের জবাবটা এবার আসবে।

"খেয়াল করে দেখেছ মার্থা, সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনও শিল্পের অনুবাদকে প্রয়োজনই হয় না? মনে হয়েছে একবারও সেটা? নাটকে হয়, সিনেমায় হয়, কেননা সেসব তৈরি হয় চিত্রনাট্য থেকে। মানে, আবারও, একধরনের সাহিত্য। কিন্তু অন্য কোনও শিল্প অনুবাদের তোয়াক্কাই করে না, সে-কথা একবারও আলাদা করে মনে হয়নি তোমার?"

"নাহ, আলাদা করে মনে হয়নি ঠিকই, কিন্তু হ্যাঁ, হয় না। তাতে কী হল?"

"পেন্টিং-এর তো অনুবাদ প্রয়োজন হয় না, কিংবা নাচের। সিম্ফনি তো সারা পৃথিবীতে একই ভাবে বাজে, তাকে তো বদলে নিয়ে যেতে হয় না অন্য মানুষের কাছে! ভাস্কর্য? তার তো প্রয়োজন হয় না কাউকে? হয় কি? জীবনে শুনেছ, শুবার্ট বা ভিভালদি-র অনুবাদ হচ্ছে? অথবা, মাতিসের অনুবাদ? রদ্যাঁ বা দেগা-র অনুবাদ করা হচ্ছে নানা দেশে, শুনেছ? শোনোনি, কেননা তা অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। কেবল সাহিত্য, ভাষার চিরকালের ক্রীতদাস, সে টেনে নিয়ে এসেছে এই ভাঁওতাকে। অনুবাদ। ভাষান্তর। ভাষা কোনও ব্রিজ নয় মার্থা, ওটা তোমার ভুল ধারণা। ভাষা আসলে একটা গণ্ডি। প্রাচীর। পরিখা। তাই এদিককার ভাষা ওদিকের মানুষ বোঝে না। তাই আমাদের মতো মিডিয়েটর, হ্যাঁ, এই শব্দটাই মাথায় আসছে এখন, আমাদের মতো মিডলম্যানদের প্রয়োজন হয় বারবার। আসলে অনুবাদ বলে কিছু হয় না মার্থা, কারণ, সবটাই অনুবাদ।"

"তোমার এই শেষ কথাটুকু আমি বুঝতে পারছি না উইলিয়ম।"

"এ তো খুব সহজ মার্থা। যে-কোনও কাজের কথা ধরো। যে-কোনও। ধরো, ডেভিড। মিকেলাঞ্জেলো-র ডেভিড। দেখেছ সামনে থেকে?"

"উঁহু।"

"আমি দেখেছি। মানুষকে থমকে দাঁড় করিয়ে রাখবার মতো ভাস্কর্য। আশ্চর্য কাজ। কিন্তু সে কি সম্পূর্ণ মৌলিক? কাউকে না কাউকে দেখে তো বানিয়েছেন সেটা মিকেলাঞ্জেলো? বাস্তব আছে তাতে, কল্পনাও আছে হয়তো। কিন্তু ছেনি হাতুড়ি দিয়ে একটা আস্ত পাথরকে ডেভিডে পরিণত করার সময়ে সেই চেহারাটা তো আকাশ থেকে পড়ছে না? সে তো তাঁর মস্তিষ্কে আছে, চোখের সামনে আছে। সেটাকে তিনি পাথরে রূপ দিচ্ছেন। মানে, অনুবাদ করছেন। যাকে আমরা মিকেলাঞ্জেলো-র মৌলিক কাজ বলে ভাবছি, তা আসলে ওঁর করা অনুবাদ। পাথরের ভাষায়। ভাস্কর্যের ভাষায়। ওই অবয়বের অনুবাদ। নিজের বাস্তব আর কল্পনার মিশেলের অনুবাদ। অনুবাদ করছেন বলেই আমরা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি, নইলে তা কেবল ওঁর হয়ে, ওঁর ভাবনার ভিতরেই থেকে যেত। তাই না? পিকাসো যে ভেঙেচুরে দিচ্ছেন গোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর আর্ট ফর্ম, সে তো ওঁর নিজের মাথার মধ্যে, নিজের ভাবনার মধ্যে, নিজের চারপাশের সময়ের মধ্যে চলতে থাকা প্রবল বদলের অনুবাদ। তাই না? সেটাকেই তিনি ধরে রাখতে চাইছেন ক্যানভাসে। এ তো সোজা হিসেব মার্থা। ভিভালদি যখন 'ফোর সিজ়নস'-এর স্কোর লিখছেন, তিনি তো তাঁর দেখা, তাঁর অনুভব করা বছরের চারখানা ঋতুকে অনুবাদ করছেন, সুরের ভাষায়। বর্ষাকাল বা বসন্ত তাঁর চোখে ঠিক কেমন, সেটা অনুবাদ করে যাচ্ছেন সুরের মাধ্যমে। ওই সুরটাই তাঁর ভাষা। আর সিম্ফনিগুলো তাঁর অনুবাদ। আমরা যেটা শুনছি, সেটা আসলে অনুবাদের উপস্থাপনা। পৃথিবীর তামাম বড় শিল্পী আসলে এক-একজন মহৎ অনুবাদক মার্থা, প্রত্যেকে। প্রত্যেকে। তাঁরা তাঁদের সময় রাজনীতি বোধ চেতনা অবচেতন বাস্তব কল্পনা জেহাদ কষ্ট ব্যর্থতা আবহাওয়া পরিপার্শ্বকে এবং সবচেয়ে বেশি করে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁদের নিজেদের অবস্থানকে অনুবাদ করে গিয়েছেন। মৌলিক বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না মার্থা। সমস্তটা অনুবাদ। তুমি, আমি, আমরা প্রত্যেকে আসলে এক বিরাট অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে বেঁচে আছি, যার নাম পৃথিবী।"

"আমার এবারে সব গুলিয়ে যাচ্ছে উইলিয়ম, সব। আমি সত্যি, এভাবে ভাবিনি কখনও।"

"গুলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, আমারও গিয়েছিল, যখন প্রথমবার এ-কথা বুঝেছিলাম যে, মৌলিক আসলে বহমান, অস্থায়ী। অনুবাদই স্থির, চিরকালীন।"

"কিন্তু তা হলে আমাকে বলো, তুমিও তো একজন অনুবাদক, এঁদেরই মতো, তাই না?"

"আমি এঁদের ধারেকাছেও নই মার্থা, সে নিশ্চয়ই তুমিও বোঝো। হ্যাঁ, আমি অনুবাদক। কিন্তু আমি কিসের অনুবাদ করি? অনুবাদের অনুবাদ। সেই হিসেবে দেখতে গেলে আমি পরজীবী। আমার নিজের খাদ্য নিজে আহরণ করবার ক্ষমতা নেই। শেক্সপিয়র নিজের সময় আর অকল্পনীয় কল্পনার মিশ্রণকে অনুবাদ করে গিয়েছেন ইংরেজিতে, আমি সেই অনুবাদকে আবার অনুবাদ করছি বাংলায় বা ফ্রেঞ্চে। ব্রেশট তাঁর রাজনীতিকে, ভাবধারাকে অনুবাদ করে গিয়েছেন জার্মানে, আমি তাকে আবার অনুবাদ করছি ইংলিশে বা স্প্যানিশে। করতে হচ্ছে, কেননা মানুষ ভাষানির্ভর প্রজাতি। কিন্তু শেষমেশ এর মধ্যে গ্লানি ছাড়া আজ আর কিছুই পাই না মার্থা।"

"এভাবে ভেবো না উইলিয়ম। কত মানুষ তোমার জন্য কালজয়ী সাহিত্যের স্বাদ পেয়েছেন, সেটা ভাবো একবার!"

"কিছু যায় আসে না তাতে। আজ আর কিচ্ছু যায় আসে না আমার। কই, পাখির ভাষা তো অনুবাদ করতে পারলাম না এত বছরে! কিংবা মানুষের লেখা কবিতা শোনাতে পারলাম না ভুট্টাখেতকে। এসবেরও তো প্রাণ আছে, ভাষা আছে। কই, অনুবাদক হয়ে তো তাদের কাছে পৌঁছতে পারলাম না একবারও! গুবরেপোকার কথা বুঝতে পারলাম না এক জীবনে, অথচ পোকারা কিন্তু সংগীত বোঝে মার্থা। পশুরা, পাখিরা সংগীত বোঝে! এমনকী গাছ, গুল্ম, তারাও বিস্তৃত সিম্ফনির সামনে শান্ত হয়ে আসে। এটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বারবার। তারা তার মানে আমাদের চেয়ে কত-কত গুণ এগিয়ে আছে ভাবো একবার! আমরা কিন্তু তাদের তৈরি করা একটি ভাষাও বুঝি না। যদি বুঝতাম, গাছ তার পাতা হাওয়ায় বারবার নাড়িয়ে কী বলছে, মানতাম আমি সার্থক অনুবাদক একজন। এই এখনকার মতো ব্যর্থ, খ্যাতিমান পরজীবী নই।"

সমুদ্রের প্রাণ নেই, মার্থা জানেন। কিন্তু ভেঙে পড়া রুপোলি চুলের বৃদ্ধ মানুষটির বহু হাত পিছনে, কাচের ওপারে, সমুদ্র, আইরিশ বে, তার বড় বড় ঢেউ নিয়ে ভেঙে পড়ছে বালির সৈকতে। স্পষ্ট অনুবাদ করে নিতে পারছেন মার্থা।

কুড়ি

—আবহাওয়া আজ মোটেই ভাল নয়, কী বলেন?

—সে কী! মোটের উপর ঝকঝকেই তো আছে চারপাশ। এর বেশি লন্ডনে আপনি কী-ই বা আশা করেন মশায়?

—তা অবশ্য মন্দ বলেননি। কিন্তু মেঘ করে আসছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন কি?

—মশায় কি লন্ডনে নতুন?

—নাহ, জন্ম থেকে লন্ডনেই আছি, তবে এদিকটায়, মানে হ্যারল্ড হিল চত্বরে বিশেষ আসা-টাসা হয় না।

—এখানে এমনিতেও বিশেষ কাজ না-পড়লে বাইরে থেকে কেউ বড় একটা আসেন বলে দেখিনি। চব্বিশ বছর হল ব্যবসা করছি, সেই এক বাসিন্দাদের এক মুখই দেখছি। আর একই ইংলিশ আকাশ। এ মরসুমে হ্যারল্ড হিলের আকাশ এর চেয়ে পরিষ্কার দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তাই আপনার কথা শুনে মনে হল হয়তো কোনও রোদ ঝলমলে দেশ থেকে সদ্য এসেছেন।

—না না মশায়, আমিও খোদ লন্ডনেরই। তা যা বলেছেন। পরিষ্কার আকাশ দেখলে এখানে মানুষের কাজে ভুল পর্যন্ত হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, এবারে বলুন। কী করতে পারি আপনার জন্য আমি? দশ মিনিটে আর-একজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি না?

—আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এই সময় আপনার কার হায়ারিং সেন্টারে। একবার দেখে নিন।

—আপনার নামটা?

—ও হ্যাঁ, খুররাম শাহজাদ বাট। কে. এস. বাট নামেও লেখানো থাকতে পারে। কালই টেলিফোনে কথা হয়েছিল আপনাদের হায়ারিং সেন্টারের সঙ্গে।

—এক মিনিট... এক মিনিট... হ্যাঁ... এই যে। পেয়েছি। খুররাম শাহজাদ বাট। আপনার কোনও ফোটো আইডি?

—ও হ্যাঁ, অবশ্যই। এই যে। পাসপোর্ট।

—কই, দেখি? হুম... বেশ... ঠিক আছে। নিন, রেখে দিন। হ্যাঁ, এবারে বলুন। কী লাগবে?

—কালই বলে রেখেছিলাম ফোনে। একটা বড় ট্রাক। সাড়ে সাত টনের। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ভাড়া নেব। কাল এই সময়ের মধ্যে ফেরত পেয়ে যাবেন।

—বড় ট্রাক? সাড়ে সাত টনের?

—হ্যাঁ। কাল বলা ছিল। প্লিজ়, একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—লন্ডনে ব্যবহার করবেন, না লন্ডনের বাইরে?

—লন্ডনেই।

—আচ্ছা। তা, লন্ডন শহর থেকে ভাড়া না-করে এই হ্যারল্ড হিল শহরতলি অবধি এলেন কেন?

—কী আশ্চর্য প্রশ্ন। আপনারা কি গাড়িটা ভাড়া দিতে চান, না চান না?

—স্যরি। কৌতূহল নয়, আমি এমনিই প্রশ্নটা করছিলাম।

—নাহ, ঠিক আছে। আসলে আমি কাল রাত থেকে এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। তাই ভাবলাম এদিককার হায়ারিং সেন্টার থেকে ভাড়া নিলে কেমন হয়। তা ছাড়া, ভালই তো জানেন, শহর লন্ডনে গাড়ির ভাড়া ঘণ্টাপিছু প্রায় এর দেড় গুণ। তাই নয় কি?

—থাক ওসব কথা। কিন্তু আমি দুঃখিত, আপনার চাহিদা অনুযায়ী সাড়ে সাত টনের ভ্যান আমি আপনাকে ভাড়া দিতে পারব না।

—পারবেন না?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। পারব না।

—আশ্চর্য! কেন জানতে পারি কি?

—অবশ্যই পারেন। সাড়ে সাত টনের ভ্যানের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স ডিপোজিট করতে হয়। তা নিশ্চয়ই কালই আপনাকে ফোনে জানানো হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—সেই টাকা কিন্তু জমা পড়েনি।

—কী বলছেন? আমার বন্ধু নিজে কাল ইন্সট্যান্ট ট্রান্সফার করেছে লন্ডন থেকে। আপনার নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে মশায়।

—রোজ একশোর ওপর গাড়ি ভাড়ায় দিচ্ছি। ভুল হওয়া মুশকিল। কোনও ট্রানজ্যাকশন হয়নি মিস্টার বাট। আমাদের অ্যাকাউন্টে আপনাদের তরফে আজ অবধি কোনও টাকা জমা পড়েনি।

—এ তো খুব অদ্ভুত কথা?

—আপনার কাছে কোনও রসিদ আছে টাকা জমার? দেখাতে পারবেন?

—নাহ, এই মুহূর্তে তো নেই।

—তা হলে আমি অপারক মিস্টার বাট। হ্যাঁ, আপনি চাইলে এখন টাকা দিয়ে অন্য কোনও ভেহিকল নিতেই পারেন, তবে সাড়ে সাত টনের ভ্যান এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই।

—আপনি এক মিনিট সময় দেবেন প্লিজ? আমি আমার বন্ধুকে একবার ফোন করে দেখতে চাই।

—নিঃসন্দেহে মিস্টার বাট। এখন পাঁচটা সতেরো বাজে। পাঁচটা পঁচিশে আমার পরের খদ্দের আসার কথা। ততক্ষণ স্বচ্ছন্দে আপনি কাউন্টারে থাকতে পারেন।

—ধন্যবাদ। জাস্ট একবার... ইয়েস, হ্যালো... ইউসেফ? হ্যালো... হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে বলছে ভ্যান বুকিং-এর অ্যাডভান্স জমা পড়েনি!... হ্যাঁ, আমি সেন্টারেই দাঁড়িয়ে আছি, হ্যারল্ড হিল-এ। তুমি কাল টাকা ট্রান্সফার করোনি?... নাহ, এদের অ্যাকাউন্টে কিছু জমা পড়েনি বলছে। আচ্ছা শোনো, রিসিট-এর কপি আছে? ছবি তুলে মেল করতে পারবে এখন?... কী?... ওহ শিট!... এত ইরেসপন্সিবল হলে... তোমাকে বারবার বলেছিলাম... না ব্যাপারটা অত সোজা নয়! মুখের কথা নয়। সাড়ে সাত টনের ভ্যান এরা এখন দেবে না। প্রিরিকোয়্যারমেন্ট ছাড়া হয় না। কীভাবে যে... এনিওয়ে আমি দেখছি কী করা যায়। ওদিকের যা-যা কাজ ছিল হয়েছে?... ওকে। বাই।

—কথা হল মিস্টার বাট?

—হ্যাঁ। ভুল আমারই। মাঝে কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে যেটা ঠিক এখুনি... মাপ করবেন।

—না না, এসব তো হতেই থাকে। তা হলে বলুন। অন্য কিছু চলবে আপনার?

—আমার কাছে এই মুহূর্তে দু'শো পাউন্ডের বেশি নেই।

—কার্ড?

—নাহ, মানে কার্ডটা... ফেলে এসেছি আর কী।

—আচ্ছা। দু'শো পাউন্ডে আপনি ভাল এসইউভি পেয়ে যাবেন।

—সলিড?

—রক সলিড। একটা প্রায় নতুন ব্ল্যাক এসইউভি আছে। বেশিদিন হয়নি। দেখবেন একবার?

—বেশ, বলছেন যখন...

—নিয়ে নিন মশায়। ভাল মাইলেজ দেবে। কাল এই সময়ের মধ্যেই ফেরত দিচ্ছেন তো?

—কাজ ঠিকঠাক হয়ে গেলে আজ রাতেও ফেরত পেতে পারেন।

—আজ রাতের মধ্যেই? দেখবেন মিস্টার বাট। আবার চোরাচালান টোরাচালান নয় তো? হাঃ হাঃ হাঃ... জাস্ট জোকিং। যা দিনকাল পড়েছে আজকাল।

—তা ঠিক বলেছেন। নাহ, ওসব কিছু নয়।

—তা হলে?

—পিকনিক। সবাই মিলে একটু মজা করা আর কী...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশ

ডিনারে ছাড়া দেখা করবার উপায় ছিল না কোনও, ক্যারোলের কাছে। কেননা গতকাল রাতে ফোন খুলে সে যখন সম্যকের মেসেজটা পায়, তখন কিছুক্ষণ সময় নিয়েছিল ভাববার, যদিও সেরকম ভাবনার বিশেষ কারণ ছিল না কিছুই, তবুও, নিয়েছিল। তারপর জানিয়েছিল, আগামিকালই দেখা করা যেতে পারে একমাত্র, কেননা তার পরদিন সে ফের চলে যাচ্ছে কেমব্রিজ, তার ক্লাসগুলো শুরু হয়ে যাবে সেইদিন থেকেই। কিন্তু ডিনারে ছাড়া উপায় ছিল না, কেননা সম্যকের ফেরার টিকিট কাটা ছিল তারও পরের দিন, সেটাকে আর এগোনো গেল না। বদলে সকাল-সকাল বেরিয়ে, হে অন ওয়াই শহর থেকে বারদুয়েক ট্রেন বদল করে তাকে এসে পৌঁছতে হল লন্ডনের প্যাডিংটন স্টেশনে, এবং বেশ সকাল-সকাল বেরিয়েও এই সফরটুকু করতে তার লেগে গেল ঘণ্টাসাতেকের কিছু বেশি।

ক্যারোল ভাবতে সময় নিয়েছিল মিছিমিছিই, কেননা সে হয়তো খুব ভেতরে, নিজের অনুমতি ছাড়াই এ-কথা বুঝতে শুরু করেছিল যে, এমনটা হবে। হঠাৎ সেদিন ট্যাক্সি ডেকে হে অন ওয়াই থেকে লন্ডন চলে এলেই সম্যকের সঙ্গে তার দেখার শেষ হবে না, বরং কাঁটাগাছে স্কার্টের কোনা আটকে থাকার মতো আর সামান্য একটু দেখা হওয়া বাকি থাকবে, আটকে থাকবে। সেটাকে সন্তর্পণে ছাড়িয়ে নেবার জন্যই এই ডিনার।

প্রথমে ক্যারোলের ফেলে আসা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মহার্ঘ কপিটা ফেরত দেওয়াকেই সম্যক দেখা করবার কারণ হিসেবে একবার তুলে ধরতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু যখন ক্যারোল এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে ওটা সে ফেলে আসেনি, বরং রেখেই এসেছে, কয়েকদিনের এই গাঢ় বন্ধুত্বের এক স্মারক হিসেবে উপহারই দিয়ে এসেছে সম্যককে, তখন সম্যককে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতেই হল যে, দেখা, আর একবার অন্তত দেখা না-করে সে কিছুতেই থাকতে পারছে না। উত্তরে, নিজের দেখা করবার কিছুটা ইচ্ছেকে সোয়েটারের নীচে বেড়ালছানার মতো আলগা চাপা দিয়ে ক্যারোল যেন একরকম রাজিই হয়ে উঠেছিল আজকের ডিনারের জন্য। লন্ডন ব্রিজ তার ভারী প্রিয় জায়গা, সন্ধের পর হেঁটে বেড়ানোর জন্য, সেখানেই হোক তবে দেখা। টেমস-এর উপর, চওড়া আর চকচকে সেতুর পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দূর পর্যন্ত বিছিয়ে থাকা ঝলমলে সন্ধেবেলার ব্যস্ত লন্ডন শহর দেখতে ভারী ভাল লাগে ক্যারোলের, ভাল লাগে পাশে বয়ে যাওয়া সাউথ ব্যাঙ্কের হইহল্লা আর জমজমাটি দেখতে। সম্যককে এখানে সঙ্গী পেলে মন্দ হবে না, ভেবেছিল সে।

প্যাডিংটন থেকে লন্ডন ব্রিজ টিউবে পৌঁছতে গেলে মাঝে একখানা স্টেশনে নেমে লাইন বদল করতে হয়, সেই স্টেশনের নাম বেকার স্ট্রিট। সম্যক যখন নামল বেকার স্ট্রিটে, তখন লন্ডন ব্রিজগামী টিউব আসতে আরও চার মিনিট দেরি। সে কেবল আশ্চর্য হচ্ছিল এই ভেবে, কেমন অজান্তে আবার শার্লক জড়িয়ে গেলেন তার স্বপ্নে। অথবা, বাস্তবে। সামনের সিঁড়ি দিয়ে ফুঁড়ে উঠলেই পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গোয়েন্দার বাড়ির রাস্তা, যেখানে কত-না মক্কেলের এক্কা এসে থেমেছে একদিন, ওয়াটসন, নোট নিয়ে রেখেছেন তার। আজ আর সময় নেই, নইলে উঠে একবার ঢুঁ মেরে আসা যেত।

সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে সম্যক প্রথমবার রাতের লন্ডন শহর দেখল। আর-একটু হেঁটে এগিয়ে গিয়েই দেখল, লন্ডন ব্রিজের বিছিয়ে থাকা চওড়া পিঠের উপর, তার দিকে পিছন ফিরে, নদীর উপর বয়ে যাওয়া অসংখ্য টিমটিমে ফেরিদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যারোল। তার চুল বরাবরের মতোই বাঁধা, যাদের খুলে দুধে ভিজিয়ে দিলে পায়েস হয়ে যাবে মুহূর্তে, আর তার পরনে আজ সাদা রঙের একখানা ওভারকোট, কালো স্ল্যাক্স আর একখানা বাদামি হাই শু যার তলা থেকে উঁকি মারছে। গ্রীষ্ম ঠিকই, কিন্তু নদীর ধারে সন্ধের পর এসে দাঁড়ালে বেশ ঠান্ডাই লাগে এখানে। জ্বর গায়ে একটা জ্যাকেট আর টুপি চাপিয়ে এসেছে সম্যক, সঙ্গে তার একখানা পিঠব্যাগ আর একটা মাঝারি সুটকেস, যা নিয়ে পরশু তাকে উঠে পড়তে হবে দেশের উড়োজাহাজে। আগামিকাল কোথাও একটা ছোট মোটেল দেখে ভাড়ায় থেকে নিতে হবে। কিন্তু তার আগে আজ। তার আগে এখন। তার আগে এই মুহূর্ত। সেই মুহূর্ত, যখন পিছনে এসে শান্ত দাঁড়িয়ে ক্যারোলের নরম ওভারকোটের কলার সরিয়ে তার কাঁধে আলতো চাপ দিল সম্যক। আর বলল, "ভাগ্যিস দেখা করতে রাজি হলে তুমি!"

মার্থা চলে গিয়েছেন অনেকক্ষণ হল। যেতে চাননি সহজেই, কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বেন, এমন বাহানা দিয়ে আগেভাগে তাঁকে একরকম ভাগিয়েই দিয়েছেন উইলিয়ম। আটটা নাগাদ টুকটুক করতে করতে একলা পায়ে ফিরে গিয়েছেন নিজের কটেজে, যেখান থেকে উইলিয়মের কটেজের দুটো জানলার হলদে উজ্জ্বল আলো স্পষ্ট দেখা যায়। একটু পরে সেই আলোখানা নিভে যেতে অবশ্য এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছেন মার্থা, মেজাজ পালটে গেলেও, উইলিয়ম তাঁকে মিথ্যে বলেননি। হয়তো এবার সত্যিই ঘুমোতে যাবেন তিনি।

উইলিয়ম ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে একবার টানা চওড়া কাচের প্যানেলটার দিকে তাকালেন। আসলে তিনি তাকালেন কাচের প্যানেলের ওদিকে, যেখানে খুব অল্প জ্যোৎস্নায় আছড়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে গাঢ় নীলচে সমুদ্রকে। আজ খুব, খুবই অল্প আলো আছে বাইরে। যেভাবে সাশ্রয়ী বাবা মাসের শেষে গুনে-গুনে হাতখরচা দেন ছেলেমেয়েদের, ঠিক সেইরকমভাবে জ্যোৎস্নার ব্যবস্থা করেছে আকাশ। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। খরচ বুঝেশুনে করাই ভাল।

সাদা শার্ট জ্যোৎস্নার ভাল বন্ধু বরাবর। খুব অল্পই জ্যোৎস্না, তবুও পালটে, একখানা কালো পুলওভার চাপিয়ে নিলেন উইলিয়ম। তারপর কটেজের, তাঁর অন্ধকার কটেজের চৌকোনো দরজা আলতো করে টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন টুক করে। এখানে কাজ মিটে গেলে অতিরিক্ত আলো জ্বালানো কেউ বড় একটা সমর্থন করেন না বলেই, মোটের উপর হোমের চারপাশ এখন অন্ধকার। সকালের পুলিশি প্রহরাও ম্লান হয়ে এসেছে সন্ধে হতে না-হতে। একটা জিপ বোধ হয় হোমের প্রধান ফটকে এসে থেমেছে একটু আগে, আওয়াজ পেয়ে সেরকমই মনে হল উইলিয়মের। হোম থেকে বেরনোর একখানাই রাস্তা, ফলে যে করে হোক, পাহারাদার লম্বাটে আর গম্ভীর বার্চ গাছেদের সারির মাঝখান দিয়ে সেই উঁচু লোহার ফটক পেরিয়েই বেরোতে হবে তাঁকে। তারপর দেখা যাবে কীভাবে কী হয়।

উইলিয়ম বেশ খানিকটা হাঁটছেন এবং হাঁটছেন। কোনওদিকে তাকাচ্ছেন না এখন, যেন কোনওদিক তাঁর প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন নয়, এইরকম এক ভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ফটকের দিকে। আজ রাতে, যে-করে হোক, একবার অন্তত সমুদ্রের ধারে পৌঁছতেই হবে তাঁকে, এ বিষয়ে তিনি স্থির। এই দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যর্থতাবোধ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র রাস্তা ওই সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে, বাতাসের দিকে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো। এ ছাড়া কোথাও কোনও আরাম নেই আর। এমনটা ভাবতে-ভাবতে যখন পাহারাদার গাছেদের বীথির এক ধার ধরে সন্তর্পণেই হাঁটছেন তিনি, যাতে এই অন্ধকারেও তাঁকে কেউ চিনে ফেলে তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে না-পারে, তখনই একটা হিসহিসে গলার স্বর শুনে কেঁপে উঠলেন হঠাৎ। এমনিতে ভয় বস্তুটা তাঁর ধাতে কোনওদিনই ছিল না, আজও নেই, কিন্তু বেরনোর পথে এই গলাটা তিনি আশা করেননি। আশা করেননি এই কথাটাও, যেটা গলার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে এই অল্প জ্যোৎস্নার ঘন বীথির মাঝামাঝি।

"কী, প্রফেসর? অভিধান খুঁজতে বেরিয়েছেন? পাবেন না... পাবেন না..."

গলাটা ডক্টর বয়েলের, পালটে যাওয়া, চোখ বেরিয়ে আসা, দাঁত বের করা অশান্ত ডক্টর বয়েলের, যাঁকে দু'দিক থেকে চেপে ধরে দু'জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনস্টেবল নিয়ে যাচ্ছেন ফটকের বাইরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ জিপ। উইলিয়ম ব্রাইটের পিছন দিক থেকে হাঁটতে-হাঁটতে এসে তাঁকে পেরিয়ে যাবার সময়ে কথাটা বাতাসে ছুড়ে দিলেন ডক্টর বয়েল। এই প্রথমবার, ঠান্ডা লাগল উইলিয়মের। হাঁটার গতি বাধ্য হয়েই বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

"এমনভাবে বলছ, যেন রাজি না-হলে দেশে ফিরতে না তুমি?"

প্রশ্নের উত্তরে মুখে সেই হাসিটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যারোল, আর তা দেখে সম্যক বুঝতে পারল, এতক্ষণ তার যে দমচাপা লাগছিল নিজের চারপাশকে, সেটা কেবল এই হাসিটা দেখতে চেয়েও পাচ্ছে না বলে, সেটা কেবল এই মুখটা তাকে দেখা না-দিয়ে ক্যাব ডেকে ছেড়ে চলে এসেছিল বলে। এরকম হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু কথা না-থাকা অনেক কিছু হয় বলেই এখনও মানুষ এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত তোলপাড় করে ছুটে আসতে চায়, এই আজ যেমন এসেছে সম্যক।

সন্ধে সাড়ে আটটার উজ্জ্বল হলুদ নেকলেস পরে শুয়ে আছে টেমস-এর দু'ধার, ক্রিস্টাল আর রুবি দিয়ে তৈরি জ্যান্ত গুবরেপোকার মতো সেই দু'ধারে ছুটে যাচ্ছে গাড়িদের হেড আর টেল লাইট, সেসবের মাখখানে, অর্ধেক ব্রেসলেটের মতো বাঁকিয়ে রাখা এই লন্ডন ব্রিজ, যেখানে এখন সবচেয়ে দামি মুহূর্তটা কাটাচ্ছে সম্যক, যা এতটাই দামি যে, সত্যি ঘটছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

ক্যারোলের মুখে অবশ্য সেই বিস্ময় নেই, বরং আছে এক ছিমছাম খুশি, উজ্জ্বল ঝাড়বাতির বিশাল বলরুমে কফির পাত্রের মতো। উপস্থিত, কিন্তু নীরব।

"হয়তো ফিরতাম না দেশে, হয়তো খুঁজতাম তোমাকে, বলা কি যায়?"

"বাবা, একদিনে এতকিছু মনে হল? তা, খুঁজে লাভ কী হত?"

"লাভের জন্যে খোঁজে বুঝি সকলে?"

"এই জায়গাটা একেবারে সংলাপ। চিত্রনাট্য লেখা সংলাপ। হাততালি মাস্ট।"

খিলখিলিয়ে হেসে উঠে দু'হাত জড়ো করে ছোট্ট আর মিঠে একদফা করতালি দিয়ে উঠল ক্যারোল। সম্যক জানে যে, ক্যারোল জানে সম্যক কী ভাবছে এবং ক্যারোল এ-ও জানে যে, তার এই জানার কথাও সম্যক জানে, কেননা সে একই সঙ্গে দ্বিগুণ গভীরতা অবধি পড়ে নিতে পারে মানুষের চোখ, এমনটাই দেখেছে সম্যক, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এমন ব্যবহার দেখে মনে হতে বাধ্য যে, কেবলই খেয়ালখুশির জন্য অতদূর থেকে ছুটে এসেছে সম্যক। ক্যারোলের এই মিষ্টি ভান আসলে সেইসব ফুলদানির মতো, যাদের একটা সময়ের পর ভেঙে ফেলতেই হয়।

সেটা করবে বলেই, একখানা চওড়া ফুলদানির মতোই, ক্যারোলের পোর্সেলিনে তৈরি ভঙ্গুর কাঁধ একঝটকায় জাপটে ধরল সম্যক, যখন ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা টুরিস্ট ফেরি ভোঁ ছাড়ল, আর শ্যাম্পেনের কর্ক খোলার আনন্দেই হয়তো, সকলে হইহই করে উঠল তার ডেক-এ। সম্যকের কেন কে জানে মনে হল, সময় বেশি নেই। বেশি সময় কখনও থাকে না। ক্যারোল এখন তার দু'চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ সেই তাকানো থেকে এক বিন্দু সপ্রতিভ কৌতুক সে জলে ফেলে দেয়নি। সম্যক বলল, "দুটো বইয়ের কথা বলেছিলে না তুমি, ক্যারোল? পৃথিবীর দু'প্রান্তের দুটো বই? যারা অজান্তেই পরস্পরের পরিপূরক? যারা একে অন্যের পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালে বা একে অন্যের পিঠে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে পড়লে কোথাও কিছু একটা হয়? একটা বড় রকমের বদল? যা আমরা টের পাই না? বলেছিলে না?"

"হুম, বলেছিলাম তো... বলেই তো ছিলাম..."

এই 'বলেই তো ছিলাম' বলবার সময়ে ক্যারোল তার ফাঁক করা ঠোঁটদুটো আর-একটু কাছে নিয়ে এল, যাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসা অবশ করা সেই তপ্ত আর মিঠে সুগন্ধটা আবারও পেল সম্যক। ক্যারোলের প্রশ্বাস। পুরনো বইয়ের চেয়েও যার সুগন্ধ অনেক বেশি।

"জিভের মধ্যে তো কত শব্দ থাকে, থাকে না? জিভ তো সমস্ত শব্দ ধারণ করতে পারে একাই। তা হলে জিভও তো একধরনের বই, তাই না ক্যারোল? জিভও পুরনো বই তো। দুটো জিভ, পৃথিবীর দু'প্রান্তের দুটো জিভ, সমস্ত শব্দসুদ্ধ, পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না?"

"এই শোনো, বই পড়বার সময়ে অত কথা বলতে নেই। শুধু বই পড়তে হয়।"

এ কথা বলে, সম্যকের এগিয়ে আসা ঠোঁট দুটোর মধ্যে নিজের দু'ঠোঁট বসিয়ে দিল ক্যারোল।

রাস্তাটা, সোজা রাস্তাটা ধরতেই তিনি পারতেন, কিন্তু সেদিকে এ-সময়ে লোকজন থাকতে পারে ভেবেই মাঝারি আর প্রাচীন সব ওক গাছের অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু রাস্তাটা নিলেন উইলিয়ম। ওই রাস্তাটা দিয়ে গেলে হাঁটাপথ অনেকখানি বাঁচত, এবং বিপদ বলতেও কিছু তেমন ছিল না, কিন্তু কারও না-কারও অযাচিত উপস্থিতির চেয়ে বড় বিপদের কথা এই মুহূর্তে তিনি মনে করতে পারছেন না বলেই, প্রধান ফটক থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে ঢাল ধরে কিছুটা নেমে কাঠের নড়বড়ে বেড়া টপকে ঢুকে পড়লেন মেঠো রাস্তাটায়, যার সারা শরীরের উপর নুয়ে এসেছে, ঝুঁকে এসেছে প্রাজ্ঞ ও বৃদ্ধ সব ওক গাছেদের দল, যেন বয়ে চলা জলধারার বুকে হরিণ তাদের গলা নামিয়েছে জল খাবে বলে, আর যার এই আঁকাবাঁকা চলা, তিনি জানেন, গিয়ে শেষ হয়েছে আইরিশ বে-র শান্ত সৈকতে।

পায়ের নীচের মাটি হালকা নরম, কোথাও-কোথাও বসে যাওয়ার মতোই। গতকালের প্রবল বৃষ্টির ছাপ এখনও এদিক-সেদিক থেকে গিয়েছে স্পষ্ট। দু'-একটা পোকার অজানা ডাক আর অচেনা আলো দেখা যাচ্ছে কাছে-দূরে, যাদের হাত দিয়ে কাটাকুটি করে সরিয়ে এগিয়ে চলেছেন উইলিয়ম।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর, যদিও কতক্ষণ তা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না উইলিয়মের, কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর একখানা তরল অথচ ঘন ও গভীর শব্দ এই বয়স্ক ওকগুচ্ছকে পেরিয়ে তাঁর কানে এসে ঝাপটা মারল, যা সমুদ্রের ভারী স্রোতের আছড়ে পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। দেরি নেই আর বেশি। বাতাসের ভেজা, নোনা, সোঁদা ভাবও সে-কথাই বলছে এবার। দেরি নেই বেশি আর।

দেরি হলও না। গাছেরা হালকা হয়ে তাঁকে পথ করে দিল আর তিনি, উইলিয়ম ব্রাইট, এই রাত্রে এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রের ধারে, আইরিশ বে-র চকচকে প্রায়-সাদা বালির শান্ত সৈকতে, যেখানে তিনি আসতে চেয়েছেন গত কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু পারেননি। আজ বুঝলেন, চাওয়াই হয়ে ওঠেনি সেভাবে।

সমুদ্রের এক ধরনের সম্মোহনী ক্ষমতা আছে, আগেও টের পেয়েছেন উইলিয়ম। বিশেষত রাতের বেলার সমুদ্রের। সে পারে না, এমন কোনও কাজ নেই। উইলিয়ম জুতোজোড়া খুলে এক পাশে পরিপাটি সাজিয়ে রেখে খুব ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন ঠান্ডা, কালচে নীল, হাত বাড়িয়ে ডাকতে থাকা সমুদ্রের দিকে।

এক সময়ে শান্ত, ভারী শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন তার সামনে।

মেলে দিলেন নিজেকে।

তাঁর পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যেতে থাকল সমুদ্রের ফেনাওঠা জিভ।

তাঁর শার্টের বোতাম খুলে দিতে লাগল ছদ্মবেশী বাতাস।

তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন চোখ বন্ধ করে।

সাশ্রয়ী সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে তিনি মেলে দিলেন নিজের দু' হাত। দু' দিকে। টানটান করে।

তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সমুদ্র, ভাঙতে থাকল নিজের ঢেউ।

ঠোঁট দুটো ক্যারোল ঠিক এমনভাবে বসাল সম্যকের ঠোঁটে, যেন ট্রেন যাবে বলে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে গায়ে গা মিশিয়ে দিল দুটো আলাদা ট্র্যাক, যেন জাহাজ চলে যাবার পর দু'দিকে উঁচু হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

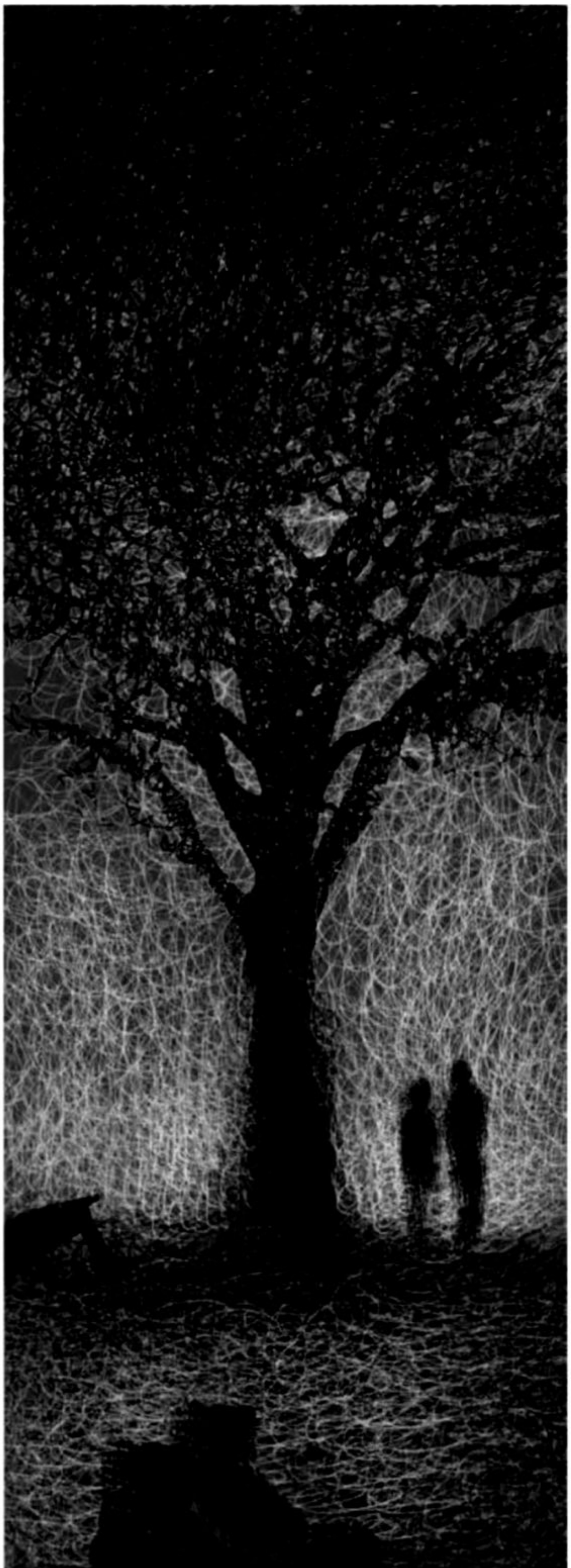

শাখায় শাখায় তিরতির করে কাঁপছে আশ্চর্য রুপোলি সব পাতা, আর তার কিছু দূরে পাশাপাশি শুয়ে আছে একজোড়া কালো বুট।

যাওয়া ওভারব্রিজের দুটো পাটাতন নিচু হয়ে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গেল এমনভাবে যে, তারা কোনওদিন বুঝি আলাদা ছিলই না।

এই মুহূর্তটার জন্যে কী আশ্চর্য তীব্রতার সঙ্গে অপেক্ষা করে থেকেছে সম্যক, সেটা সে বুঝল প্রথমবার তার ছটফটে জিভ ক্যারোলের শান্ত, মিঠে, আঠালো আর নরম জিভের সঙ্গে একবার জড়িয়ে যাওয়ায়। আর ক্যারোল বুঝতে পারল ঠিক কতখানি অস্থির আর আগ্রহী হয়ে আছে সে নিজেও, যখন তার নিজেরই জিভ অচেনার মতো ব্যবহার করতে শুরু করল সম্যকের মুখের মধ্যে, যখন তার অবাধ্য জিভ আর গোল হয়ে আসা ঠোঁটের সুড়ঙ্গ শুষে নিতে চাইল সম্যকের মুখের মধ্যেকার যাবতীয় স্বাদ। ঠিক সেই সময়ে সম্যকের চোখ বুজে এল ক্যারোলের প্রশ্বাসের সুগন্ধের নরম শরীরে, জিভের অভিমানী আঠালো ধাক্কা খেতে-খেতে, যখন তার জ্যাকেটের পরদা ভেদ করে তেতে থাকা জ্বোরো বুকে আলতো করে লাগতে থাকল ক্যারোলের সম্মতিসূচক তপ্ত দুই বুক, যাদের আদুরে আর পিঠোপিঠি দুটো খরগোশ বাচ্চার চেয়ে বেশি কোনও দাবি নেই এই মুহূর্তে। আর এই সময়ে ক্যারোলেরও চোখ বুজে এল, কেননা সম্যকের ডান হাত কখন তার ঘাড়ের পিছনে গিয়ে কৌশলে খুলে ফেলেছে তার চুল-আটকে-রাখা ছোট্ট ক্লিপটাকে, খুলে ফেলে দিয়েছে নীচে বয়ে যাওয়া প্রাচীন এক নদীর জলে, আর তারপর সেই ডান হাতের পাতা আর পাঁচ আঙুল দিয়েই আঁকড়ে ধরেছে তার ঝরনার মতো সাবলীল চুলের গুচ্ছকে, যেভাবে ডুবে যাওয়ার আগে গাছের ঝুরিকে আঁকড়ে ধরে কেউ।

আর দু'জনেরই চোখ বুজে এসেছে বলে, দু'জনেই পরস্পরের জিভ বেয়ে অন্য পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে বলে, দু'জনেই এই দৃশ্য দেখতে পেল না যে, তাদের পিছন থেকে প্রবল গতিতে লন্ডন ব্রিজে উঠে আসছে একটা বিশালাকার ভ্যান। একটা কালো এসইউভি। তারা দু'জন সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জড়ো করে একটা মাত্র চুমুর মধ্যে ঢেলে দিয়েছে বলে টের পেল না যে, কালো ভ্যানটা এলোপাথাড়ি ভাবে চলতে শুরু করেছে ব্রিজের উপরে, ডান বাঁ খেয়াল রাখছে না, গতি বাড়িয়ে নিয়েছে, আর চারপাশের মানুষ আতঙ্কে প্রথমবার চিৎকার করে ওঠার মুহূর্তেই সে তার বনেটের ধাক্কায় রেলিঙের গায়ে পিষে ফেলছে একজন জ্বলজ্যান্ত পথচারীকে। তারা দু'জন দু'জনের শক্ত আলিঙ্গনের বেষ্টনীতে একটা গোল ঘুরন্ত পরদার আড়ালে চলে গিয়েছে বলেই শুনতে পেল না চারপাশের মানুষজনের প্রবল আর্তনাদ এবং দৌড়ের মরিয়া ও অসহায় শব্দ, যখন কালো ভ্যানটা আর-একজন পথচারীকে জড়িয়ে নিচ্ছে চাকার তলায় আর মুহূর্তে তার দেহটাকে থেঁতলে ফেলছে সন্ধের লন্ডন ব্রিজের ওপর। তারা দু'জন পরস্পরের আন্তরিক সুগন্ধের ঘূর্ণির মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে আছে বলেই দু'খানা টাটকা মৃতদেহের রক্তের ঝাঁজালো ও নোনতা লাল গন্ধ তাদের নাকে এসে লাগল না, যখন ভ্যানটা আরও একবার বাঁক নিয়ে, আরও একজনকে প্রবল ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিয়ে ঠিক তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ভ্যানের চড়া গোল হেডলাইট তাদের থেকে ঠিক তিন ফুটের দূরত্বে যখন, যখন তার ইঞ্জিনের হিংস্র গরগরানি ঝাপটা মারছে সম্যকের কালো জ্যাকেটের পিছন দিকটায়, আর যখন ভ্যানের চালকের আসনে বসে থাকা লোকটি প্রবল জোরালো মুঠোয় চাপ দিয়ে গাড়ি তুলে নিচ্ছে থার্ড গিয়ারে আর ভ্যানটাও সেই উসকানিতে তেতে উঠে হঠাৎ-ছাড়া-পাওয়া নেকড়ের মতো তুলে দিচ্ছে তার সামনের দুটো চাকা, পরবর্তী শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপ দেবে বলে, তখনই, ঠিক তখনই, ওই চুম্বনের সান্দ্র দেওয়াল দিয়ে তৈরি অন্য পৃথিবীর মধ্যে, হঠাৎই সম্যকের ঠোঁটে বেশ জোরে একখানা কামড় বসালো ক্যারোল, তার জেগে ওঠা নরম দাঁত দিয়ে। সম্যক তার প্রত্যুত্তরে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ক্যারোলকে, আর বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত হাত চালানোর জন্য বেশ নড়েচড়ে গেল সম্যকের ব্যাকপ্যাক। দু'খানা পুরনো কাব্যগ্রন্থের মাঝখানে শুয়ে থাকা ডিওডোর্যান্টের ক্যান সেই ঝাঁকুনিতে গড়িয়ে গেল এক পাশে। মলাটের সঙ্গে মলাট, শরীরের সঙ্গে শরীর লেগে গেল তখনই, সেই দুই পুরনো কাব্যগ্রন্থের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেই মুহূর্তে খুলে গেল একখানা দরজা। অন্য কোথাও।

দু'দিকে প্রসারিত অগণন বইয়ের র‍্যাকের তলা থেকে জল সরে গেল, যেন লকগেট খুলে গিয়েছে কোথাও। কালো, ঘন, আর ঠান্ডা জল খুব আস্তে আস্তে সরে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে, দূরে, একটা ফাঁক জেগে উঠল। আকাশে, নাকি মাটিতে, নাকি জলের গর্ভে, বলা যায় না। আলো দেখা গেল, বা দেখা গেল এই অন্ধকারের চেয়ে হালকা কোনও অন্ধকার।

জলের নীচে প্রোথিত কবেকার শেকড় বয়ে-বয়ে সেই খুলে যাওয়া দরজা, সেই নিষ্ক্রমণপথের দিকে এগিয়ে গেলেন দু'জন। একজন ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা, অপরজন গাউন।

হাঁটুজল ভাঙতে-ভাঙতে, অজস্র মাইল বই পেরিয়ে পেরিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন খোলা আকাশের নীচে, ভোররাতের সৈকতে, চিকচিকে প্রায়-সাদা বালির কাছাকাছি।

তাঁরা একবার পরস্পরের দিকে তাকালেন, আর মৃদু হাসি বিনিময় করলেন। তারপর এগোলেন আরও।

পায়ের তলায় ঝুরি হয়ে নেমে যাওয়া শিকড়কে টেনে-টেনে তাঁরা উঠে এলেন সৈকতের বালির উপরে, যেখানে কেউ কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই কোথাও। এমনকী কোনও শব্দ, বা আলো।

শব্দ বলতে কেবল সমুদ্রের আছড়ে পড়া, আলো বলতে কেবল আকাশ।

তাঁরা দেখতে পেলেন, সৈকতের উপর, দু'দিকে দুই শাখা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন এক গাছ, তার বয়স্ক, কালো বল্কলের গায়ে ছড়ে যাওয়া সময়ের রেখা।

শাখায় শাখায় তিরতির করে কাঁপছে আশ্চর্য রুপোলি সব পাতা, আর তার কিছু দূরে পাশাপাশি শুয়ে আছে একজোড়া কালো বুট।

এই দৃশ্যের সামনে তাঁরা দু'জন স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ।

তারপর আরও কয়েক পা এগিয়ে, গাছের দু'দিকে দুই কোটরে কান রাখলেন দু'জনে।

অনেক দূরে, মাঝসমুদ্রে তখন ভাসছে দুটো কাঠের টেবিল, একটা পুরনো টাইপরাইটার, আর হলদে হয়ে যাওয়া একখানা খাতা।

সেই বয়স্ক বৃক্ষের দুই কোটরে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকলেন দু'জন।

ভোর হয়ে এল হয়তো।

হয়তো আর কখনও ভোর হবে না।

বৃক্ষ, তাঁদের কাছে টেনে নিল।

**উপন্যাসের ১১ নং পরিচ্ছেদে সিলভিয়া প্ল্যাথ রচিত 'দ্য ডিটেকটিভ' কবিতাটি ব্যবহৃত হয়েছে।*
*** ১৪ নং পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে 'দ্য ইগলস'-এর 'হোটেল ক্যালিফোর্নিয়া' গানের একাংশ।*

অঙ্কন: সৌরীশ মিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~